রূপমতী

রূপমতী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বসু সাহিত্য সংসদ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র, ১৩৬৬

প্রকাশক
অমিয় বসু
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রক
প্রাণকৃষ্ণ পাল
শ্রীশশী প্রেস
৪৫, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

দাম ২.৫০

কবি হরপ্রসাদ মিত্র
বন্ধুবরেষু

গল্পক্রম

ছায়াসঙ্গিনী, নীলকণ্ঠ, অন্ত্যেষ্টি,
বাড়ী বদল, খেলনা, ক্ষত, করাত

এই লেখকের কয়েকখানি বই

উপনিবেশ (তিন খণ্ড)

স্বর্ণসীতা

সূর্য সারথি

শিলালিপি

লালমাটি

সঞ্চারিণী

মহানন্দা

শ্রেষ্ঠগল্প

স্ব-নির্বাচিত গল্প

অসিধারা

মেঘরাগ

সাপের মাথার মণি

সাহিত্যে ছোট গল্প

বাংলা গল্প বিচিত্রা

ছায়া সঙ্গিনী

সব কথা আজকে আমি খুলে বলব। নইলে আর আমি সময় পাব না।

ভারী আশ্চর্য লাগছে একটা জিনিস ভাবতে। এতদিন সবাই আমাকে দেখেছে—রুপো রঙের আলোয় কত মানুষের মুগ্ধ চোখের সামনে ঝলমলিয়ে উঠেছি আমি। অথচ, আমার অস্তিত্ব যে কোথাও আছে কেউ সে-খবর জানত না। যখন চলে যাব তখনও কেউ জানবে না আমি কোনোদিন ছিলুম।

বোধহয় হেঁয়ালির মতো ঠেকছে। এবার সব স্পষ্ট করেই বলব। কিছু আর আড়াল রাখব না। এতদিন আড়ালে আড়ালেই তো ছিলুম। অনস্তিত্বের এই ছদ্মবেশের অন্তরালে এখন আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। যে না-থাকার অভিনয় এতদিন ধরে করে আসছি, এইবারে সেইটেকেই সত্য করে তুলব।

আবরণ তবে সরেই যাক।

আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে। ঠাকুর্দার টোল ছিল—ছেলেবেলার স্মৃতির ভেতরে সে-সব এখনো আবছা হয়ে আছে। এখনো স্বপ্নের মতো মনে পড়ে শামুকের খোলা-ভর্তি নস্যি নিয়ে ঠাকুর্দা ছাত্রদের পড়াতে বসেছেন—চিৎকার করে কী যেন বোঝাতে চাইছেন আর মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টিকিতে বাঁধা একটা জবাফুল এদিক-ওদিক দোল খাচ্ছে।

কালের হাওয়ায় বাবা স্কুলে-কলেজে পড়লেন। অফিসে চাকরি নিলেন। কিন্তু সংস্কৃত চর্চার অভ্যাস তাঁর গেল না। বাড়িতে নিজে সংস্কৃত পড়তেন, বাংলা পুরাণ পড়তেন—আমাদেরও পড়াতেন। আমরা দু' ভাই—দু' বোন : চারজনের মধ্যে আমি তৃতীয়।

ভাইয়েরা স্কুলে গেল—কলেজেও গেল তার পরে। কেবল আমাদের দু'বোনের ব্যাপারেই অদ্ভুত রকমের রক্ষণশীলতার পরিচয় দিলেন বাবা। আমাদের স্কুলে যেতে দিলেন না। বাড়িতে বসেই আমি সংস্কৃতের গোটা দুই পাশ করে ফেললুম। আর শিখলুম সীতা-সাবিত্রী হওয়ার নির্ভুল শাস্ত্রীয় পন্থা।

ফস্‌কা গেরো ছিল ওইখানেই।

সিনেমায় আমরা যেতে পেতুম বই কি। তবে বাছা বাছা বই ছিল। ধর্মমূলক, পৌরাণিক, উপদেশপূর্ণ। একদিন ওইরকম একটা কী ছবি দেখতে গিয়েই আমার প্রথম আত্মদর্শন হল।

আমার বয়েস তখন পনেরো। বাবার শাস্ত্রীয় শাসনে আর কিছু না হোক—উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যে আমার শরীর ভরে উঠেছিল। তা ছাড়া লম্বাটে গড়নের জন্যেও বয়েসের চাইতে আমাকে বেশ বড়ই দেখাত।

আমরা দু' বোন ছবি দেখতে গিয়েছিলুম দূর-সম্পর্কের এক দাদার সঙ্গে। বাবা তাকে খুব বিশ্বাস করতেন। আজকে তার পুরো নামটা আর বলবার দরকার নেই, ডাক-নাম মনুদাই বলি।

তখন ইণ্টারভ্যালের আলো জ্বলেছে, মনুদা বাইরে গেছে পান খেতে। আমরা দু' বোন চুপ করে বসে আছি—হঠাৎ একটা কথা কানে উড়ে এল।

ছাখ্‌ ছাখ্‌—তাকিয়ে ছাখ্‌ ওদিকে—

মেয়েদের সহজ সংস্কারে আমরা টের পাই। অনেক দূরে লুকিয়ে বসে পেছন থেকে কেউ চোরা চাউনি ফেললেও তা আমাদের অনুভূতিতে সাড়া জাগায়। বুঝতে পারলুম আমাদের লক্ষ্য করেই বলা হচ্ছে।

তাকিয়ে দেখলুম সামনের দিকে গুটিকয়েক ছোকরা। কলেজের ছাত্র হওয়াই সম্ভব। তাদের দৃষ্টি ঘুরে আছে আমাদের দিকে—বিশেষ করে আমারই মুখের ওপর। একজন বলছে, ওই লাল-শাড়িপরা মেয়েটিকে দেখেছিস রে? প্রায় অবিকল এক চেহারা! হঠাৎ দেখলে মনে হয়—মিতালী দেবী বসে রয়েছে।

শুনে আমার মুখ রাঙা হয়ে গেল। কিন্তু আমার ছোট বোন বারো বছরের খুকু হেসে উঠল খিল্‌খিলিয়ে।

আমি ধমক দিয়ে বললুম, কী হাসছিস তুই অসভ্যের মতো!

খুকু হাসি বন্ধ করলে, কিন্তু চোখছুটো ওর চকচক করতে লাগল। চাপা গলায় বললে, ওরা কিন্তু ঠিকই বলেছে দিদি। হঠাৎ তোকে দেখলে মিতালী দেবীই মনে হয়!

আমি আরও লাল হয়ে বললুম, ছিঃ—চুপ কর।

আলো নিভে এল। ছবি আরম্ভ হবে আবার। পান চিবুতে চিবুতে নিজের জায়গায় ফিরল মনুদা। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

কিন্তু তার পরে ছবিতে আমার আর মন বসল না। রক্তের মধ্যে কোথা থেকে ছোট একটা ঢেউ উঠে পড়ল। আমার এই পনেরো বয়েসের মধ্যে অনেক সংস্কৃত বই পড়েছি আমি—নিজের ছোট এই জীবনটুকুর ভেতরে ছোট বড় অনেক দোলা লেগেছে অনেকবার। কিন্তু এ যে আজ কী হল আমি কিছুতেই বুঝতে পারলুম না। একটা আশ্চর্য উত্তেজনায় আমার হৃৎপিণ্ড কাঁপতে লাগল—মনে হতে লাগল চাপা জ্বরের উত্তাপ ফুটে উঠছে শরীরে।

ছবি দেখে রাস্তায় বেরিয়ে অন্যমনস্কের মতো চলেছি, হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে খুকু বললে, জানো মনুদা—কী একটা মজা হয়েছে আজকে?

কিসের মজা রে?

জানো, দিদিকে দেখে কয়েকটা ছেলে বলছিল—

আমি রাগ করে বললুম, চুপ কর, বাঁদর মেয়ে।

খুকু বললে, বা-রে, দোষের কথা তো কিছু বলে নি। ওরা বলছিল, দিদি নাকি ঠিক ফিল্মস্টার মিতালী দেবীর মতো দেখতে।

আমি আরও রাগ করে বললুম, ছাই।

মনুদা একবারের জন্যে থেমে দাঁড়ালো—দুটো চোখ সম্পূর্ণ করে মেলে ধরল আমার দিকে। তখন আমার মুখের ওপর পথের

ইলেক্‌ট্রিক লাইট আর আকাশের জ্যোৎস্না একসঙ্গে খানিক অদ্ভুত আলো ফেলেছিল। সেই আলোর মায়ায় আর আমার পনেরো বছরের লাবণ্যে মনুদাও বোধহয় আমাকে নতুন করে দেখল।

অদ্ভুত ধরাগলায় মনুদা বললে, খুব অন্যায় বলে নি কিন্তু।

খুকু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

কেমন, দেখলি তো দিদি?

আমি—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মেয়ে—সেই অহমিকা আমার ভেতরে ফণা তুলল। বললুম, এ-সব যা-তা বোলো না মনুদা। শুনলেও অপমান হয়।

অল্প একটু হেসে মনুদা বললে, আমার ওপর রাগ করা মিথ্যে। দোষ তাকেই দে টুনু—যে তোদের দু'জনকে একই ছাঁচে ঢেলে তৈরি করেছে।

আমি জবাব দিলুম না। হনহন করে আগে আগে হাঁটতে আরম্ভ করলুম। টের পাচ্ছিলুম, যতটা জোরে হাঁটছি—সে-তুলনায় হাঁপাচ্ছি অনেক বেশি।

পথে আর বিশেষ কোনো কথা হল না। শুধু বাড়িতে ঢোকার মুখে খুকুকে শাসিয়ে বললুম, একথা যদি আর কাউকে বলবি, তা হলে গলা টিপে দেব তোর।

খুকু ঘাড় নেড়ে বললে, আচ্ছা।

কিন্তু খুকুকে শাসন করলেও নিজের মনের গলা তো টিপে বন্ধ করতে পারি না। সারারাত আমি ঘুমুতে পারলুম না। আমার রক্তে যন্ত্রণার মতো কী যেন খেলে বেড়াতে লাগল। আমার চেহারা অবিকল একজন ফিল্মস্টারের মতো দেখতে! আমাকে দেখে লোকে মিতালী দেবী বলে ভুল করতে পারে। ছিঃ—ছিঃ! মহা-মহোপাধ্যায় বংশের মেয়ে আমি—এ লজ্জা রাখব কোথায়।

অথচ, শুধুই কি লজ্জা! তার সঙ্গে কোথায় যেন একটা সুখ মিশে আছে—নেশা-জড়ানো একটা উত্তেজনা লুকিয়ে আছে কোথাও। আচ্ছা, আমি যদি সত্যিই মিতালী দেবীর মতো নামকরা

ফিল্মস্টার হতুম—কী হত তাহলে? মিতালী দেবীর এত নাম—কাগজে কাগজে তার ছবি, শুনেছি, অনেক টাকাও সে রোজগার করে। সে কি খুব সুখী?

তার পরেই নিজেকে আমি তীব্রতম ধিক্কার দিলুম। আমি মহা-মহোপাধ্যায় বংশের মেয়ে—কিছুদিন পরে উপাধি পরীক্ষা দিয়ে 'সরস্বতী' হব—এ-সব আমি কী ভাবছি! ফিল্মের মেয়েরা যে কত খারাপ—সে কথা কতজনের মুখে কতবারই তো শুনেছি। শেষ পর্যন্ত আমি কিনা—

বিছানা ছেড়ে উঠে এলুম। জানালার ঠিক সামনেই সপ্তর্ষি। পনেরো বছরের স্বচ্ছ সহজ দৃষ্টিতে আমি দেখলুম বশিষ্ঠের পাশেই অরুন্ধতীর সতী-প্রদীপ জ্বলছে—ধ্রুবলোক থেকে তিমিরগহন পার হয়ে আমার মাথার ওপর আলোকের কণায় কণায় ঝরছে শুচিস্মিত আশীর্বাদ। আমি মহিম্ন স্তোত্র উচ্চারণ করতে লাগলুম নিঃশব্দে।

দিন কয়েক ভালোই কাটল। ঠিক করলুম, আর সিনেমায় যাব না। মনের ভেতরে যে ছোট্ট ঢেউটা উঠেছিল, ধীরে ধীরে তা মিলিয়ে এল একদিন।

কিন্তু সিনেমায় যাওয়ারও দরকার হল না।

আমাদের বাড়ি থেকে গঙ্গা খুব দূরে নয়। বাবার সঙ্গে ভোরে গঙ্গাস্নান করতে যাই রোজ। সেদিনও গিয়েছিলাম।

স্নান করে যখন ফিরছি—তখন সামনে লাল হয়ে সূর্য উঠছিল। নিজেকে আমি দেখি নি—তবু জানতুম সেদিন আমাকে কেমন দেখাচ্ছিল। আমার পনেরো বছরের শাদা-শান্ত কপালে চন্দনের ফোঁটার ওপর সূর্যোদয়ের লাল আলো পড়ে অরুন্ধতীর সিঁদুরের মতো মনে হচ্ছিল; আমার পরনের গরদের শাড়িটারও ছিল শ্বেতচন্দনের রঙ; আমার দু'খানি পা যেন পথের ওপর লক্ষ্মীর পদলেখা এঁকে দিচ্ছিল।

ঠিক সেই সময়েই কে যেন কাকে বললে, ওই মেয়েটিকে দেখেছ?

বাবা একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন, শুনতে পেলেন না। কিন্তু শব্দভেদী বাণ এসে ঠিক আমার বুকে বিঁধল। কে বলছিল আমি জানি না—তাকিয়েও দেখি নি—কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই আমার পা থমকে দাঁড়ালো।

সেই গলা আবার বললে, হঠাৎ দেখলে কী মনে হয় বলো তো?

আর-একটি অলক্ষ্য স্বর বললে, ঠিক যেন "যৌবন-যমুনা" ছবিতে মিতালী দেবী। গঙ্গাস্নান করে ফিরে আসছেন।

আমার রক্তে এবার আর ছোট একটুখানি তরঙ্গই জাগল না—হঠাৎ যেন ঝড় এসে আছড়ে পড়ল। আমি দ্রুত পায়ে নিজের বুকের শব্দ শুনতে শুনতে এগিয়ে চললুম। আকাশে তখনও সূর্যের লাল রঙ—কিন্তু আমি টের পাচ্ছিলুম, আমার কপাল থেকে অরুন্ধতীর সিঁদুর মুছে গেছে।

সারাটা দিন যেন কিছুতেই আর মন বসতে চাইল না। বাবার কাছে পড়তে গিয়ে এমন একটা ছেলেমানুষি ভুল করে বসলুম যে বাবা আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দিন তবু একরকম গেল, রাতটাই অসহ্য।

কপালের দু'পাশে দপ্‌দপ করতে লাগল—চোখের পাতা যতই বন্ধ করতে চাই, ততই কে যেন তা জোর করে টেনে রাখল। আশপাশের বাড়ি থেকে, বাইরের পথ থেকে প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি শব্দ অস্বাভাবিক জোরালো হয়ে এসে আমার কানের পর্দায় ঘা দিতে লাগল। আমি আবার জানলার পাশে এসে দাঁড়ালুম। কিন্তু আজ আর আকাশে সপ্তর্ষি দেখা যাচ্ছিল না—ধ্রুবতারাও নয়, একটা ছাইরঙা ভূতুড়ে মেঘে ঢাকা পড়ে ছিল সব।

সেইদিন থেকেই নিজের কাছে আমি হারতে আরম্ভ করলুম।

জোর করেও ঠেকাতে পারলুম না—কিছুতেই না। আমার বই গেল, উপাধি পরীক্ষা গেল, এতদিনের শিক্ষাদীক্ষা সব গেল। যে-মুহূর্তেই হাল ছেড়ে দিলুম, সেই থেকেই আর কোথাও এতটুকু সংশয় রইল না। বাবার চোখ এড়িয়ে, খবরের কাগজ আর

এখান-ওখান থেকে মিতালী দেবীর ছবি যোগাড় করতে লাগলুম। আর ঘরের দোর বন্ধ করে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মিলিয়ে দেখতুম আমাদের দু'জনের মিল কতখানি। আমার হাসিতেও অমনি করে গালে টোল পড়ে কি না—আমি বিষণ্ণ হয়ে উঠলে আমার মুখেও অমনি ক্লান্ত বেদনা ছড়িয়ে পড়ে কি না, আমার চোখের তারাতেও অমনভাবে মনের আলো ঝিকিয়ে ওঠে কি না!

শেষ পর্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠল। মনুদাকে চুপিচুপি ছাদে ডেকে নিলুম।

আমাকে মিতালী দেবীর ফিল্ম দেখাবে মনুদা?

মিনিটখানেক মনুদা চুপ করে চেয়ে রইল আমার দিকে। ওর মুখের ওপর কতগুলো অদৃশ্য রেখা ফুটে উঠেছে বলে আমার মনে হল।

মনুদা বললে, মিতালী দেবী তো ধর্মমূলক ছবিতে নামে না।

যাতে নামে তাই আমি দেখব।

কিন্তু মামা তো তোকে যেতে দেবেন না।

নিজের ওপর আমার তখন আর কর্তৃত্ব ছিল না। নির্লজ্জ স্পষ্ট ভাষায় বললুম, তুমি ব্যবস্থা করে দাও।

তার পরে শুরু হল মিথ্যার পালা। চিড়িয়াখানায় যাওয়ার নামে, মনুদাদের বাড়ি যাওয়ার নামে, বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্নের নামে। বাবা মনুদাকে বড় বেশি বিশ্বাস করতেন।

আর আমি? মিথ্যার পথে একবার যখন পা দিলুম—তখন আর ফেরবার পথ কোথায়? কখনো কখনো খারাপ লাগত না তা নয়—কিন্তু সেই মুহূর্তেই হয়তো পর্দার ওপর মিতালী দেবীর ছবি ফুটে উঠত। এইমাত্র হয়তো নায়ক তার নীরব প্রেমকে উপেক্ষা করে নিষ্ঠুরের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, আর অসহ্য যন্ত্রণায় বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মিতালী। তার সেই যন্ত্রণা আমার হৃৎপিণ্ডকেও যেন দলে-মুচড়ে একাকার

করে দিত। শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে আমিও প্রাণপণে কান্না চাপবার চেষ্টা করতুম।

আর তার মধ্যেও কানে আসত।

আশ্চর্য—ঠিক এক চেহারা!

যমজ বোন নয় তো?

ছাখ্ না জিজ্ঞেস করে—সত্যিই বোন নাকি?

আমি ভাবতুম—বোন নয়, আমরা এক। কার যেন বিচিত্র খেয়ালে ছুটো আলাদা শরীরে ভাগ হয়ে গেছি আমরা। ওর দুঃখ, ওর আনন্দ, ওর ভালোবাসা—সব আমার। রাত্রে চমকে উঠতুম এক-একদিন। আচমকা মনে হত, জানলা দিয়ে তরুণকুমার এসেছে আমার ঘরে, আমার কপালে তার হাত রেখে গভীর গলায় বলছে, আমায় ক্ষমা করো মাধবী। আমি তোমায় ফিরিয়ে নিতে এসেছি। আর অভিমান করে থেকো না—এসো আমার সঙ্গে।

শুধু একটা কথা কোনোদিন ভাবি নি। আমার মনের ছোঁয়াও কি মিতালী পায়? পায় কোনোদিন?

নেশার ঘোরে দিন কেটে যাচ্ছিল। ঘা পড়ল শেষ পর্যন্ত।

সিনেমা দেখে বেরিয়েছি। তরুণকুমারের কোলে মিতালীর মৃত্যুদৃশ্য তখনো চোখে নয়—বুকের মধ্যে বিঁধে আছে। আমার দু'কান ভরে তখনো বাজছে তরুণকুমারের কান্না: এসো রমা—তুমি ফিরে এসো—

আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি পড়ছে তখন। হল থেকেও বেরিয়েছি আর সেই সময় কোথা থেকে বাবাও ছুটতে ছুটতে এসে আশ্রয় নিলেন লবীতে।

লুকোবার কোনো জায়গা নেই—মিথ্যে বলবার মতো ফাঁক নেই এতটুকুও। বিস্ময় আর বেদনার বোবা দৃষ্টিতে বাবা কেবল একবার আমার দিকে তাকালেন। একটা কথাও বললেন না। বাইরের বৃষ্টির দিকে চোখ মেলে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সমস্ত অনুভূতি স্তব্ধ হয়ে গিয়ে আমিও দাঁড়িয়ে রইলুম সেইভাবেই। মনুদা এর মধ্যে কোন্ দিকে যে ছিটকে পড়েছিল সে আমি জানি না।

বৃষ্টি থামলে বাবা আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, টুনু, যাবে তুমি আমার সঙ্গে ?

বললুম, চলো।

বাড়ির পথে আমাকে একটা কথাও বললেন না। কৈফিয়ত চাইলেন না, ধিক্কার দিলেন না, গালমন্দও করলেন না। সংসারে এমন বিশ্বাসঘাতকতাও আছে—যার জন্যে ক্ষোভ করবার, নালিশ করবার শক্তিও মানুষ হারিয়ে ফেলে। শুধু নিঃশব্দে প্রায় কুঁজো হয়ে বাবা পথ চলতে লাগলেন।

পথে কিছু বলেন নি, বাড়িতেও না। কোনো কথা জানতে দিলেন না মাকেও। কেবল পরদিন খেতে বসে বললেন, আজ অফিস থেকে ফিরতে একটু দেরি হবে। একবার কালীঘাটে যাব। রাধিকা চাটুয্যের বড় ছেলে এবার এম-এ পাশ করে ভালো চাকরি পেয়েছে। ভাবছি টুনুর সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাড়ব।

আমি দরজার পাশে বসে বাবার জন্যে সুপুরি কুচোচ্ছিলুম। একটুর জন্যে আমার আঙুলে জাঁতির চাপ পড়ল না।

মা আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কি কথা। তুমি যে বলেছিলে, কাব্য-ব্যাকরণ পাশ না করিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবে না ?

বাবা বললেন, তা বলেছিলুম বটে। কিন্তু সুপাত্র পেলে আর দেরি করে লাভ কী! তা ছাড়া টুনুর যে বিয়ের বয়েস হয় নি তা-ও তো নয়। আমাদের পরিবারে ন' বছরে গৌরীদান হত বরাবর। তুমিও তো বারো বছরে এ-সংসারে এসেছিলে, মনে আছে সে কথা ?

শাড়ির আঁচল দাঁতে চেপে, মা কী বলেন তাই শোনবার জন্যে আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম।

মা কিন্তু অতি সহজেই মেনে নিলেন বাবার কথা। একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করলেন না।

বেশ তো, ভালো ছেলে যদি হয়, দেখো না কথাবার্তা কয়ে। আর মেয়ে তো আমাদের লক্ষ্মীর প্রতিমা। স্বভাবচরিত্রে, রূপেগুণে এমন মেয়ে কলকাতায় আর-একটিও নেই।

বাবা সংক্ষেপে বললেন, হুঁ।—ওই ছোট্ট শব্দটুকুর ভেতরে যে কতখানি বেদনা, ঘৃণা আর ব্যঙ্গ মিশে আছে, সেটা অনুভব করে আমার ঘরের মেঝেয় একেবারে মিশে যেতে ইচ্ছে হল।

কিন্তু আর আমি কী করতে পারি? ধরা যখন পড়েছি—তখন আর ফেরবার পথ নেই। যা করবার আজই করতে হবে এক্ষুনি।

বাবা অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্নুদাকে আমি চিঠি লিখলুম। তার পরে মা যখন তেতলায় পুজোর ঘরে গেছেন, আর খুকু স্নান করতে গেছে কলে, তখন টুপ্ করে রাস্তায় বেরিয়ে মোড়ের লেটার বাক্সে চিঠিটা ছেড়ে দিলুম।

বাবা মন্নুদাকে বড় বেশি বিশ্বাস করতেন। অত বিশ্বাস করে ভালো করেন নি।

…কিন্তু এ-সব তো ভূমিকা। এ আর বাড়িয়ে লাভ কী। বাইরে কোথায় যেন ঘড়ির শব্দ হচ্ছে—রাত বারোটা। বেশি সময় আমি আর দিতে পারব না। যা বলবার এখুনি বলে নিতে হবে।…

অফিস থেকে ফিরে বাবা টিউশন করতে গেছেন। দোতলায় পুজোর ঘরে মা সন্ধ্যের শাঁখ বাজাচ্ছেন। সেই সময় আমি ঘর ছাড়লুম।

সমস্ত রাত কেঁদেছি। নিজের কাছে নিজে প্রার্থনা করেছি—মুক্তি দাও, এই সর্বনাশের নেশা থেকে আমায় মুক্তি দাও। পরের দিনটা জ্বর হয়েছে বলে বিছানায় পড়ে থেকেছি, কিছু খাই নি। তবু পারলুম না। আমার এতদিনের সব শিক্ষা—সব সংস্কার কোথায় ভেসে চলে গেল।

মহামহোপাধ্যায় বংশের মেয়ে আমি। কত সতীর কত পবিত্র রক্ত বইছে আমার শরীরে। তবুও আমার ঘর ছাড়তে হল।

মন্নুদা পাকা লোক। ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিল। আর সেই ট্যাক্সিতে ছিল আর-একজন অচেনা মানুষ। কোটপ্যান্ট-পরা, চোখে নীল চশমা।

মন্নুদা আমার কানে কানে বললে, ভয় নেই। উনি আমাদের নিয়ে যাবেন। লাইনেরই লোক।

ট্যাক্সি চলল। পেছনে পড়ে রইল সেই রাস্তা—যে রাস্তা দিয়ে প্রত্যেক দিন আমি গঙ্গাস্নান করে ফিরে আসতুম। পড়ে রইল সেই বাড়ি—যে বাড়িতে মা এখনও সন্ধ্যার শাঁখ বাজাচ্ছেন।

ট্যাক্সি এসে থামল বালীগঞ্জের এক প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে। উঠলুম তারই তেতলার এক ফ্ল্যাটে।

ফিল্ম ডিরেক্টার দত্ত একটা ছোট টেবিলের সামনে নীল আলো জ্বেলে কী যেন লিখছিলেন। আমাদের দিকে ভালো করে না তাকিয়েই বললেন, বসুন।

আমরা বসলুম। একটা সোফার নরম গদির মধ্যে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে এতক্ষণ পরে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। মনে হল আমি তলিয়ে যাচ্ছি। আমার শরীরের নিচে সোফার গদি নেই, মেজে নেই, কিছুই নেই ; আমাকে যেন কেউ একরাশ পেঁজা তুলোর মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে, আর আমি আস্তে আস্তে তার ভেতর দিয়ে অতলান্ত শূন্যতায় নেমে চলেছি। ঘরের ভেতর কোথায় যেন ফুল আছে—কোথাও ধূপের কাঠি জ্বলছে—গন্ধ পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি না। ওই গন্ধের সঙ্গে আমাদের পুজোর ঘরের গন্ধ এক হয়ে গিয়ে আমার সমস্ত চেতনাকে অবশ করে আনল।

হঠাৎ কোথা থেকে একরাশ তীব্র আলো এসে আমায় জাগিয়ে দিলে। লেখা শেষ করে দত্ত উঠেছেন, জোরালো আলোটা জ্বেলে দিয়েছেন। আমি নড়েচড়ে সন্ত্রস্ত হয়ে বসলুম।

দত্ত দু'পা এগিয়ে এলেন। মিনিটখানেক অপলক চোখে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তার পর বিস্ময় আর হতাশা মেশানো গলায় বললেন, একি কাণ্ড করেছ অনিল!

সেই নীল চশমা-পরা ভদ্রলোক, অনিলবাবু বললেন, কেন স্যার—আমার তো ভালোই মনে হল।

ভালো!—ডিরেক্টার বললেন, একে দিয়ে কী হবে? এযে মিতালীর নকল। একে কে চান্স দেবে? আসল থাকতে নকলকে নেবে কে?

এক মুহূর্তে আমার সারা শরীর হিম হয়ে গেল। যে-কথাটা আমার অনেক আগে বোঝা উচিত ছিল সে-কথা বুঝতে পেরেছি অনেক দেরিতে। কিন্তু এখন আমি কোথায় দাঁড়াব? যে-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি সেখানে তো আর আমার ফিরে যাওয়ার পথ নেই।

আমার পনেরো বছরের চোখের সামনে সারা পৃথিবীর আলো নিভে গেল। আমি প্রথম আত্মহত্যার কথা ভাবলুম।

ডিরেক্টার জানলায় পিঠ দিয়ে আবার আমার দিকে তাকালেন। বললেন, কিছু মনে করবেন না। আপনার নিজের যদি কোনো চেহারা থাকত, আমি আপনাকে সুযোগ দিতুম। কিন্তু ভগবান আপনার সে-পথ বন্ধ করে রেখেছেন। ফিল্ম লাইন আপনার নয়—আপনি ফিরে যান।

আর্তনাদ করে উঠল মন্টুদা।

ফিরে যাবে কী করে? বাড়ি থেকে যে পালিয়ে এসেছে।

বাড়ি থেকে পালিয়ে!—ডিরেক্টার চমকে উঠলেন: ছিঃ ছিঃ—এ কী করেছেন!—সমস্ত মুখে তাঁর বিব্রত বিরক্তি ফুটে বেরুল: কিন্তু আমি কী করি বলুন তো? খামকা আমাকে এমন বিশ্রী ফ্যাসাদের মধ্যে ফেললেন কেন?

আমি উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলুম। না—কাউকেই আমি ফ্যাসাদে ফেলতে চাই না। আমার পথ খোলাই আছে। গঙ্গার কালো জল জীবনের সব কালোকে মুছে দিতে পারে। আমি ঠিক খুঁজে নিতে পারব গঙ্গা কোন্ দিকে।

ঠিক তক্ষুনি কে যেন বললে, আসতে পারি মিস্টার দত্ত?

গলার স্বর নয়—সেতারের তারে যেন ঝঙ্কার উঠল। বিদ্যুৎ ছুটে গেল আমার মাথার ভেতরে। ও গলা আমি চিনছি। শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই চিনেছি।

দরজার পর্দা সরিয়ে মিতালী ঢুকল।

দত্ত হেসে উঠলেন: আরে কী কোয়েন্‌সিডেন্স্! এসো মিতালী—এসো। একটা মজার জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে।

ইচ্ছে করছিল, এই ঘর থেকে পাগলের মতো এই মুহূর্তে আমি ছুটে পালিয়ে যাই। চিড়িয়াখানার জীবের মতো সকলের কৌতুক আর কৌতূহল-ভরা দৃষ্টির আমি শিকার হতে চাই না। আমিও মহামহোপাধ্যায় বংশের মেয়ে, আমারও নিজের একটা মহিমা আছে—আমারও একটা মর্যাদা আছে। কিন্তু তবুও আমি যেতে পারলুম না। এতদিন যাকে আমার একাত্মা বলে জেনেছি, স্বপ্নে কল্পনায় যার সঙ্গে নিজের মিল খুঁজেছি, আজ প্রতিদ্বন্দ্বীর জ্বলন্ত চোখ মেলে তাকে আমি দেখতে লাগলুম। আজ মনে হল, মিতালী যদি পৃথিবীতে না থাকত, তা হলে ওর সব সম্মান —সব সৌভাগ্য আমিই পেতুম। আগে থেকে ডাকাতের মতো এসে মিতালী আমার সব অধিকার কেড়ে নিয়েছে।

আমি মিতালীকে দেখছিলুম।

ঝলমলে শাড়ি, ঝক্‌ঝকে গয়না—মুখের ওপরে রঙের পুরু প্রলেপ। ওর সঙ্গে আমার মিল কোথায়?

চমক ভাঙল দত্তের গলার স্বরে।

এঁকে দেখছ তো মিতালী? অবিকল তোমার চেহারা?

তাই নাকি?—তুলি দিয়ে আঁকা ভ্রূ কপালে মিতালী আমার দিকে তাকালো। আমি সইতে পারলুম না—মাথা নামিয়ে নিলুম। মিতালী বললে, ওমা—কী হবে!

দত্ত হেসে উঠলেন। বললেন বেশ হয়েছে। তুমি যদি মিথ্যে নিজের দর বাড়াতে চাও—কন্‌ট্রাক্টে গোলমাল করো, তা হলে এঁকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নেব। লোকে টেরও পাবে না।

বেশ তো, তাই করবেন।—বলে হেসে উঠেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল মিতালী। আমার পাশে এসে বসে দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, তোমার নাম কী ভাই?

আমি কথা বলতে পারলুম না। আমার চেতনা যেন আবার আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। মিতালীর গায়ের একরাশ তীব্র সুগন্ধির

ঘূর্ণির মধ্যে আমি হারিয়ে গেলুম। অস্পষ্ট গলায় নিজের নামটা বলেছিলুম কিনা আমার তাও আজ আর মনে নেই।

অনেক দূর থেকে বাঁশীর মতো মিতালীর গলা শুনতে পেলুম : একটা কাজ করুন না মিস্টার দত্ত। পরশু আউটডোরে যাচ্ছেন তো? সবই তো লংশটে নিচ্ছেন? আমার বদলে এঁকে নিয়ে যান না। আমি দিনকয়েক রেস্ট্ নিই।

দত্ত যেন চমকে উঠলেন।

তোমার লংশটগুলো?

মিতালী বললে, ক্ষতি কী! ক্লোজ-মিড্ সব তো ফ্লোরেই নেবেন। লংশটগুলো ওঁকে দিয়েই চালিয়ে দিন না?

আর ভয়েস?

ডাবিং করবেন।

কতগুলো দুর্বোধ্য শব্দ স্বপ্নের ঘোরে আমার কানে আসতে লাগল। তারই মধ্যে দেখলুম, দত্ত উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করলেন বারকয়েক। যেন নিজের সঙ্গেই কথা কইলেন : ডুপ্লিকেট? তা আইডিয়াটা নেহাত মন্দ নয়। হলিউডেও আছে।

ডুপ্লিকেট! শব্দটা পরিষ্কার কানে এল। জানতুম না—ওই শব্দটাই আমার ভবিষ্যৎ। আমার পরিণাম।

আর সেইদিন থেকেই আমি মুছে গেলুম। মুছে গেলুম পৃথিবী থেকে।

আমি ফিল্মে নামলুম।

আমি? না—আমি নই। রুপো রঙের পর্দায় কতবার কত-ভাবে আমি ঝলমল করে উঠেছি। অথচ কোথাও আমি ছিলুম না। কত রূপে কতবার আমি দেখা দিয়েছি, অথচ কেউ আমাকে দেখতে পায় নি। অস্তিত্বহীন অস্তিত্ব নিয়ে আমার নতুন পথের যাত্রা শুরু হল।

সেই প্রথমবারের কথা মনে পড়ছে।

সাঁওতাল পরগণার এক পাহাড়ী নদী থেকে স্নান করে উঠছি।

কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল—গায়ের রক্ত জমে যেতে চায়। অথচ, কিছুতেই নিস্তার নেই। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে আমাকে ভিজে গায়ে থাকতে হল, তিন-চারবার নানাভাবে উঠে আসতে হল জল থেকে।

শীতে কষ্ট পাচ্ছিলুম—কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। তার চাইতেও অনেক বেশি লজ্জা, অনেক বড় অপমান আমাকে দাঁত চেপে সইতে হল সেদিন। সেই স্নানের দৃশ্যটাকে অত করে ফিল্‌মে তোলবার একটিমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল। ছবির গল্পে দরকার থাক আর নাই থাক, আমার শরীরকে ভাঙিয়ে একদল দর্শকের রুচিকে খুশি করাই ছিল দৃশ্যটির লক্ষ্য।

সে অপমানও সহ্য করেছিলুম। সন্ধ্যার শঙ্খ শুনতে শুনতে যেদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলুম—সেদিন থেকেই জানতুম পিছল পথে পা দিয়েছি। কিন্তু এ জ্বালার সঙ্গে আরও বড় জ্বালা ছিল। আমার দেহের মোহে তন্দ্রা-জড়ানো চোখে ওরা মিতালীকেই স্বপ্ন দেখবে—আমাকে নয়! ওদের প্রীতিতে ওদের শ্রদ্ধায় আমার ঠাঁই নেই—ওদের বাসনা-সঙ্গিনীও আমি হতে পারব না।

সেই শুরু।

জঙ্গলের পথ দিয়ে, কাঁটাবনের মধ্য দিয়ে আমাকেই ছুটতে হয়েছে—মিতালী রাজি হয় নি। কাঁটায় হাত-পা ছড়ে গেছে, রক্ত ঝরেছে দরদরিয়ে। আর সেই সময় গাছের ছায়ায় বসে জাপানী পাখা দিয়ে হাওয়া খেয়েছে মিতালী। তার পর পর্দায় সেই ছবি যখন ফুটে উঠেছে—তখন দর্শকেরা মিতালীর জন্যেই চোখের জল ফেলেছে—আমার জন্যে নয়।

ক্রমে ফিলম লাইনের অন্তরঙ্গ মহলে আমার নাম ছড়িয়ে পড়ল। না—আমার নয়। মিতালীর ডুপ্লিকেটের নাম। আমি ছায়ার মতো সব ছবিতে ওকে অনুসরণ করতে লাগলুম। ও দশ হাজার পনেরো হাজারে কণ্ট্রাক্ট সই করত—আমি পেতুম—কখনো তিন শো, কখনো পাঁচ শো।

অভ্যস্ত হয়ে এলুম। অস্তিত্বহীন এই অস্তিত্বের বেদনাও সব সময় থাকে না। কেবল মধ্যে মধ্যে এক-একটা আকস্মিক আঘাতে যন্ত্রণা টন্‌টনিয়ে উঠত।

সহানুভূতিভরে মিতালী বলত: বেচারীকে সারা জীবন ডুপ্লিকেট করেই রাখবেন নাকি? একটা চান্স দিন না এবার।

লীলাভরে হেসে ডিরেক্টার কিংবা প্রোডিউসার বলতেন, তা হলে তোমার গতি হবে কী? তুমি তো একেবারে বেকার হয়ে যাবে।

হাই তুলে মিতালী বলত: না হয় হলুমই বেকার। বিস্তর ছবিতে কাজ করেছি—অনেক তো হল। এবার আপনারা ছুটি দিন আমায়।

তা হলে তোমার নামের কপিরাইটটাও ছেড়ে দেবে তো?

বেশ তাও দেব।—বলেই ফস্‌ করে আমার গলা জড়িয়ে ধরত মিতালী: টুনু আমার সই। ওর জন্যে সব আমি স্যাক্রিফাইস্‌ করতে পারি।

কথায় কথায় গলা জড়িয়ে ধরা মিতালীর স্বভাব। প্রথম প্রথম রোমাঞ্চ হত—কিন্তু গা ঘিনঘিন করত তারপর থেকে। মনে হত একটা সাপ গলায় পাক দিচ্ছে—তার সর্বনাশা ফাঁস থেকে নিজেকে কিছুতেই আমি ছাড়াতে পারছি না—আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চাইছে।

মিতালী আমার জন্যে নিজেকে স্যাক্রিফাইস্‌ করবে! আমি জানি, মিতালী জানে, সবাই জানে। রসিকতা। অথচ কী নিষ্ঠুর —কী যে হৃদয়হীন! যেদিন মিতালী থাকবে না—সেদিন আমিও একটা সাগরের বুদ্বুদের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যাব। যদি আজ মিতালীর মৃত্যু ঘটে, তা হলে ওর সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে সহমরণে।

আর তখনই বুকের ভেতরটা জ্বালা করত। বিষক্রিয়া শুরু হত রক্তে। মিতালীর ওপরে একটা অসহ্য ঘৃণায় আমি যেন হিংস্র হয়ে উঠতুম।

আরও ছিল। তরুণকুমারের সঙ্গে যখন শুটিং করতে হত—তখন।

লংশটে তার হাত ধরে এগিয়ে এসেছি কতদিন। কিন্তু যে মুহূর্তে ক্যামেরা মুখোমুখি হয়েছে, তখন তরুণকুমার প্রেমের কথা বলেছে মিতালীকেই। কাঁটায়-ভরা বনের পথ দিয়ে রক্ত-ঝরা পায়ে ছুটতে ছুটতে পাথরের ওপর আমি আছড়ে পড়েছি—কিন্তু তরুণকুমার যার মাথা কোলে তুলে নিয়ে ভালোবাসার সব কথা উজাড় করে দিয়েছে—সে আমি নই।

বাসর সাজাতে হয়েছে আমাকে—আর সেই বাসরের রাণী হয়েছে মিতালী।

কতদিন আউটডোর শুটিঙে গিয়ে আমি আর মিতালী রাত কাটিয়েছি এক ঘরে। হয়তো জানালা দিয়ে দেখা দিয়েছে সেই পুরোনো সপ্তর্ষি—হয়তো বশিষ্ঠের পাশে জ্বলেছে অরুন্ধতীর সতী-প্রদীপ, হয়তো ধ্রুবনক্ষত্রের কিরণকণা পুরোনো দিনের মতোই আমার মুখের ওপরে আশীর্বাদের মতো ঝরে পড়তে চেয়েছে। আমি সহ্য করতে পারি নি। জানলা বন্ধ করে দিয়েছি।

আর ঘুমন্ত মিতালীর দিকে ক্ষুব্ধ বাঘিনীর মতো জ্বলন্ত চোখ মেলে রেখে ভেবেছি, এই রাতে আমি ওকে ইচ্ছে করলেই খুন করতে পারি—সরিয়ে দিতে পারি আমার এই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বীকে। এরই জন্যে পৃথিবীতে আমি থেকেও নেই। আমার শারীরিক সত্তার মতো মনটাও এরই জন্যে শূন্য আর নিরর্থক হয়ে গেছে। এই মিতালীই আমার কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। যে সম্মান, যে অর্থ, জীবনের সবচেয়ে বড় যে সার্থকতা—সব কিছু থেকে এ-ই তো বঞ্চিত করেছে আমাকে।

আমি আমার পথের কাঁটা এখুনি সরিয়ে দিতে পারি। এই মুহূর্তেই পারি। না—তবুও আমি পারি না। আমি জানি, মিতালীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে সহমরণে।

...ছটো বাজল। বাইরে সেই ঘড়িটা আমার সঙ্গে রাত

জাগছে। দিনের আলো ফুটলে আমি আর জেগে থাকব না। ও জেগে থাকুক। ওর চোখে কখন শেষ ঘুম আসবে, সে-খবর শুধু ওই জানে।

স্টুডিওতে শুটিং চলছিল। আমার কোনো কাজ ছিল না—টাকার জন্যে এসেছিলুম। মিতালীর মতো আমি ভাগ্যবতী নই। আমার বাড়িতে কেউ চেক পৌঁছে দেয় না—সেজন্যে আমাকেই ঘোরাঘুরি করতে হয়।

ফ্লোরে মিতালীর কাজ হচ্ছিল। সেখানে দাঁড়াতে আমার ভালো লাগল না। টাকাটাও পেতে একটু দেরি হবে। আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলুম। স্টুডিয়োর বাগানের নিরিবিলি এক কোণায় যেখানে কতগুলো আইভি একটা বসবার জায়গাকে ঢেকে রেখেছে, আমি সেখানে এসে বসলুম। দেখতে লাগলুম, সামনের একটা শিউলী গাছে একজোড়া বুলবুলি তাদের বাসা বাঁধছে।

দেখছিলুম আর বুকের ভেতরটা কি রকম লাগছিল। কোনো কারণ ছিল না—তবু কখন আমার চোখে জল এল।

একি—টুনু ? চুপচাপ বসে বসে কাঁদছ এখানে ?

আমি চমকে উঠলুম। তরুণকুমার। চোখের জল মুছে ফেললুম তৎক্ষণাৎ।

আপনি এদিকে !

ফ্লোরের গরমে মাথা ধরে গিয়েছিল। একটু হাওয়া খেতে বাগানে বেরিয়েছিলুম। দূর থেকে আবছাভাবে ঝোপের আড়ালে তোমাকে দেখে এগিয়ে এলুম।

আমি ঠাট্টা করে বললুম, ভারী নিরাশ হলেন তরুণদা। এসে দেখলেন আমি মিতালী নই।

তরুণকুমার আমার পাশে বসে পড়ল। সিগারেট ধরিয়ে বললে, না—সে ভুল আমি করি নি। বাগানের ভেতরে এসে একা কী করে বসে থাকতে হয়—মিতালী তা জানে না। ও হলে আরও সাত-আটজনকে জমিয়ে এনে এখানে হাসি-গল্পের আসর বসিয়ে দিত। তোমার মতো চোখের জল ফেলত না।

এ-সব কেন বলছে তরুণকুমার? এ তুলনা কেন? আমি ওর মুখের দিকে তাকালুম।

আর তরুণকুমারও আমার দিকে তাকিয়ে রইল। যেন দুটো কালো রঙের তারা ফুটে রইল আমার চোখের সামনে। তার পর বললে, মিতালী ছবিতে খুব কাঁদতে পারে। কিন্তু জীবনে কোথাও ওর কান্না নেই। আর তোমাকে দেখলে কী মনে হয় জানো? তোমার চোখদুটো এত তরল যে, হঠাৎ একদিন কোঁটাকয়েক শিশিরের মতো টপ টপ করে ওরা ঝরে পড়তে পারে।

সাজিয়ে সাজিয়ে ও-সব ছবির ডায়ালগের মতো কথা আমাকে কেন শোনাচ্ছে? আমি কি খুশি হব? কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলুম, আমার চোখ আবার জলে ভরে আসছে। বলা যায় না—কিছুই বলা যায় না। হয়তো এখুনি সত্যি সত্যিই ওরা তরুণকুমারের পায়ের ওপর টুপ টুপ করে ঝরে পড়ে যাবে।

দু'আঙুলে অন্যমনস্কভাবে সিগারেটটা ধরে রেখে তরুণকুমার আবার বললে, আমি ভাবি টুনু, মিতালীর তো আর সবই আছে। শুধু এই রকম চোখ যদি থাকত! যদি তোমার চোখ দুটো ওকে তুমি দিতে পারতে!

আমার চোখের জল সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে এল। তরল হয়ে যারা গড়িয়ে আসছিল, হীরের মতো কঠিন হয়ে গেল তারা। আমাকে দিতে আসে নি তরুণকুমার—কিছুই দিতে আসে নি; মিতালীর পাওনা থেকে একটি কণাও সে আমাকে দেবে না। তার বদলে আমার চোখ দুটোকে সে কেড়ে নিতে এসেছে। শিশুকে গলা টিপে হত্যা করে ডাকাত যেমন তার সোনার হারছড়া নিয়ে গিয়ে নিজের রাত্রির সঙ্গিনীকে উপহার দেয়!

আমি তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালুম। তিক্ত স্বরে বললুম, বেশ তাই হবে। মরবার সময় উইল করে যাব, আমার চোখ দুটো যেন মিতালীকে উপহার দেওয়া হয়।

রাগ করলে নাকি? বোসো টুনু, বোসো—

কিন্তু আমি বসতে পারলুম না। বাগান থেকে সোজা বেরিয়ে এসে, স্টুডিয়োর গেট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে এলুম। টাকাটার জন্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলুম না।

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমি বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লুম। কত দেব আমি—কত আর মিতালী কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে? আমার পরিচয়, আমার অস্তিত্ব, আমার স্বপ্ন, আমার বাসনা—সবই তো সে নিঃশেষে লুট করে নিয়েছে। বাকী আছে আমার কান্না—আমার চোখ। তাও নেবে? তার পর? তার পর আমার কী হবে? এই অস্তিত্বহীন অস্তিত্বকে আমি বইব কী করে?

অথচ তখনও মিতালী এক গাল হেসে ঝুপ করে আমার পাশে বসে পড়বে। সাপের মতো দুটো হাত দিয়ে হঠাৎ আমার গলা জড়িয়ে ধরবে, আমার দম বন্ধ হয়ে আসবে, আর আধো আধো আদুরে গলায় বলতে থাকবে: টুনু আমার সই। ওর জন্যে আমি সব করতে পারি।

পৃথিবীতে এমন কুৎসিত অপমান এর আগে বুঝি কেউ কাউকে করে নি।

আমি হিংস্রভাবে বালিশের ওপর নখ বসিয়ে দিলুম। মনে হতে লাগল একটা বুনো জন্তুর মতো ধারালো নখের আঁচড়ে আমি যেন কার গলা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি!

কিন্তু এ তো একদিনের কথা নয়। এই যন্ত্রণা—এই জ্বালা—এ যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি সহজ হয়ে উঠলুম। তাকিয়ে দেখলুম, টেবিলের ওপর 'কল-কার্ড' পড়ে আছে। চারদিন পরে কাশী যাওয়ার প্রোগ্রাম—কয়েকটা আউটডোরে মিতালীর ডুপ্লিকেটের কাজ করতে হবে।

সে পরশুর কথা। কিন্তু আজ আমি ঠিক করে ফেলেছি। কাশী আর আমি যাব না। ডুপ্লিকেটের ভূমিকায় অভিনয় আমার শেষ হয়ে গেছে।

বিকেলে তরুণকুমার এসেছিল।

শোনো, সুখবর আছে। এই পাঁচ বছর পরে শেষে রাজী হয়েছে মিতালী।

কিসে রাজী হয়েছে?—আমার হৃৎপিণ্ড চমকে উঠল।

আমাকে বিয়ে করতে। আসছে মাসের সাতুই। রেজেস্ট্রি হবে ওই দিন। রাত্রে প্রীতিভোজ।—হলদে রঙের একটা চিঠি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, যেয়ো কিন্তু।

আশ্চর্য হলুম? না। খুব বেশি আঘাত পেলুম? তাও না। আজ তিন বছর ধরে মনে মনে আমিও এই দিনের জন্যেই তো প্রতীক্ষা করছিলুম। হয়তো আধো ঘুমে স্বপ্নের মতো এ-কথাও ভেবেছি, মিতালীর ভেতর দিয়ে তরুণকুমারকে আমিও পাব—হয়তো মিতালীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কথাও ওর মনে পড়বে।

হাসবার চেষ্টা করে আমি বললুম, নিশ্চয় যাব।

তরুণকুমার বেরিয়ে যাচ্ছিল। দরজার গোড়ায় গিয়ে ফিরে দাঁড়ালো। কী ভেবে, সেদিনকার মতো আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে তোমাদের দু'জনকেই একসঙ্গে বিয়ে করতে পারলে মন্দ হত না।—তার পর খানিকটা দুর্বোধ্য হাসি হেসে বললে, সে উপায় যখন নেই—তখন মাঝে মাঝে আসতে হবে তোমার কাছে। মিতালীর বুকে কান্না নেই—সে চোখের জল ফেলতে জানে না। যখন চোখের জলের জন্যে প্রাণ ছটফট করে উঠবে, তখন তোমার কাছেই আমাকে আসতে হবে টুনু।

তরুণকুমার চলে গেল। বাইরে মোটরের শব্দ শুনতে পেলুম।

ব্যাস্—এই পর্যন্তই। আর নয়। আর আমি সইতে পারব না। দুঃখ দেবে একজন আর কান্না দেব আমি? পর্দার অভিনয়ে মুক্তি নেই—জীবন ভরে এমনিভাবে আমাকে ডুপ্লিকেটের কাজ করে যেতে হবে? আমার বুক-ফাটা চোখের জলে নিজের জ্বালা জুড়িয়ে আর-একজনকে সান্ত্বনা দেবে তরুণকুমার?

আমি পারব না। এতদিন পরে বুঝেছি এইবারে সব শেষ করে

দেওয়ার সময় এসেছে। নিজের অস্তিত্বহীন অস্তিত্বকে এইবারে সম্পূর্ণ মুছে দিতে হবে।

উত্তরের জানলা খোলা। আজ দেখতে পাচ্ছি সপ্তর্ষিকে—দেখছি বশিষ্ঠের পাশে ধ্যানমগ্না অরুন্ধতীকে। মনে পড়ছে, আমি মহামহোপাধ্যায় বংশের মেয়ে। আমাকে সংস্কৃত পড়াতে পড়াতে বাবা বলছেন, আমার মেয়েকে আমি এ-যুগের মৈত্রেয়ী করে তুলব। ব্রহ্মবাদিনী। যেনাহং নামৃতাস্যাম্—

রাত শেষ হয়ে আসছে। সেই ঘড়িটায় চারটে বাজল। একটু পরেই যাব গঙ্গাস্নান করতে। আকাশে লাল হয়ে সূর্য উঠবে—আমার কপালে ছড়িয়ে পড়বে সতীসিঁদুর। আমার আর সময় নেই।

সায়নাইড খেয়ে শেষ রাত্রে আত্মহত্যা করেছিল মেয়েটি। এই চিঠিটা চাপা দেওয়া ছিল নীলরঙের ছোট শিশিটার তলায়।

নীলকণ্ঠ

অফিস থেকে অত্যন্ত বিশ্রী মেজাজ নিয়ে ফিরেছে সুকুমার। প্রথম ব্যাপার হল, এবার পুজোয় খুব সম্ভব 'বোনাস্' পাওয়া যাবে না এবং তাদের ইউনিয়নের এমন জোর নেই যে, তা নিয়ে একটা আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। দু'নম্বর, অজিত মুখোটি ফস্ করে বলে বসল : তোমরা সব রাশিয়ার দালাল।

তর্ক বাধলেই এমনিভাবে আক্রমণ করে লোকটা। হিটিং বিলো দি বেল্ট। অফিসের দাবিদাওয়ার প্রশ্ন—তার মধ্যে অকারণ বাজে কথা টেনে আনা। আমাদের দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগের সঙ্গে রাশিয়ার যে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই এ কথা কোনোমতেই বোঝানো যাবে না অজিত মুখোটিকে।

অগত্যা পাল্টা জবাব দিতে হয়েছে।

আর তুমি কোত্থেকে টাকা পাও মুখোটি ? ফরমোসা ?

হাতাহাতির উপক্রম হচ্ছিল, সবাই মাঝখানে পড়ে থামিয়ে দিলে। কিন্তু মনের সেই বিশ্রী বিরক্তিটা কিছুতেই কাটতে চাইছে না সুকুমারের। অহেতুক বিদ্বেষ—অর্থহীন কলহ। এ যুগে যেন প্রত্যেকে প্রত্যেককে ঘৃণা করে। মানুষে মানুষে ওই একটি ছাড়া আর কোনো সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না এখন। ট্রামে, ট্রেনে, অফিসে, খেলার মাঠে, চায়ের দোকানে। তর্ক, নিন্দা, অপমান, হাতাহাতি। কেউ আর কাউকে সহ্য করতে পারে না।

এমন কি ঘরেও নয়। সেখানেও যেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচিত্র প্রাগৈতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

বাড়িতে পা দিয়েই সেটা অনুভব করল সুকুমার। গলির ভেতরে অন্ধকার ঘরে বিকেল সাড়ে পাঁচটাতেই অকাল সন্ধ্যা

নেমেছে। আর জানলার পাশে ছায়ার ভেতরে আরও একরাশ ঘন ছায়া রচনা করে বসে আছে অনুশ্রী।

দরজার সামনে সুকুমার দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজেকে যেন প্রস্তুত করে নিলে কয়েক মুহূর্তে। আজ আবার একটা কিছু ঘটবে। ঘণ্টাখানেক তিক্ত কলহ—স্নায়ুছেঁড়া যন্ত্রণা, আধপেটা খাওয়া আর বিনিদ্র রাতের প্রহরগুলিতে ঘড়ির আওয়াজ শুনতে শুনতে একান্ত প্রার্থনার মতো নিজের মৃত্যু কামনা করা। সুকুমার তৈরি হয়ে নিল।

আলো জ্বালাও নি যে?

অনুশ্রীর জবাব এল না।

সুকুমার দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। জানলার পাশে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে অনুশ্রী। সামনে তেতলা বাড়িটার ওপর দিয়ে আকাশ খুব বেশি দেখা যায় না। কিন্তু যেটুকু দেখা যায়, তার মধ্যেই যেন অনুশ্রী নিজের মুক্তি খুঁজছে। সুকুমারের কাছ থেকে মুক্তি—এই জীবন থেকে মুক্তি।...

...সুকুমার জানে, সে অনুশ্রীকে সুখী করতে পারে নি। বাড়ির সঙ্গে সব সম্বন্ধ মুছে দিয়ে, পরিবারে ঝড় তুলে অনুশ্রী এসেছিল তার কাছে। ভেবেছিল, সুকুমার পুরুষের মতো চারদিকের অপমান থেকে তাকে রক্ষা করবে, তাকে মর্যাদা দেবে, পুরো দাম দেবে তার ত্যাগের, তার ভালোবাসার। কিন্তু অনুশ্রী জানত না সুকুমার দেবতা নয়, তার ভুল আছে, তার ত্রুটি আছে, তার দুর্বলতা আছে। চারদিকেই দুর্যোগের ভেতরে সে অনুশ্রীর কাছেই আশ্রয় চায়, অনুশ্রীকে একান্ত করে আশ্রয় দেবার শক্তি নেই তার।

শুরু হল ভুল বোঝবার পালা। বিষ জমতে লাগল দিনের পর দিন।

সুকুমার জানে আজ আট বৎসর ধরে অনুশ্রী মুক্তি চাইছে তার কাছ থেকে। দেখছে, তার চোখে অদ্ভুত বন্যদৃষ্টি, তার

মুখ যন্ত্রণায় নীল। যেন হিংস্রতম শত্রুকে দেখছে এমনি ভঙ্গিতে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে কতদিন। সামনে থেকে খাবারের থালা ছুড়ে ফেলে দেবার বর্বর প্রেরণা অনেক কষ্টে সংযত করেছে সুকুমার।

নিদ্রাহীন রাতে মাথার মধ্যে যখন লক্ষ লক্ষ যন্ত্রণার ছুঁচ বিঁধেছে ঘড়ির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে, সে যখন নিজের মৃত্যু-কামনা করেছে, তখন হয়তো চোখে পড়েছে, মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে পড়ে অনুশ্রী কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে। সহানুভূতির উচ্ছ্বাসে নিজের যন্ত্রণা ভুলে গেছে সুকুমার, পাশে এসে বসেছে অনুশ্রীর। মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার সাহস হয় নি, কেবল গভীর মমতায় মন্ত্রোচ্চারণের মতো নিঃশব্দে বার বার বলেছে, ছুটি দেব, এবার তোমায় ছুটি দেব। আর এমন করে বেঁধে রাখব না।

ছুটি দেওয়া খুব শক্ত কাজ নয়। সিভিল ম্যারেজের বিয়ে। আগুন আর শালগ্রাম শিলা সাক্ষী থাকে নি, ধ্রুবতারা আশীর্বাদ করে নি, হোমের ধোঁয়ায় পিতৃলোকের ছায়াশরীর আবির্ভূত হয় নি, সপ্তপদীর পদসঞ্চারে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন তৈরি হয় নি, চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে দু'জনে ঘর বেঁধেছে। রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ইহ-পরকালের অচ্ছেদ্য ডোর নয়—ওটাকে ছিঁড়ে টুকরো করতে কয়েক সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগে না।

কিন্তু!

ওই কিন্তুটাই আশ্চর্য। সুকুমার জানে ওই ঘৃণার সঙ্গে কী অন্ধ ভালোবাসা পাকে পাকে বেঁধেছে অনুশ্রীকে। সুকুমার কাছে থাকলে সে সহ্য করতে পারে না। দূরে চলে গেলে আরও অসহ্য লাগে। একদিনের জন্যে সে কলকাতার বাইরে গেলে অনুশ্রী ছটফট করে—পথের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। মেয়ে খুকু না থাকলে হয়তো রান্নাবান্নাও সে করত না। অথচ বাড়ি ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই বিচিত্র অভ্যর্থনা।

এত তাড়াতাড়ি এলে যে? —অনুশ্রীর ঠোঁটের কোণে জ্বালা

ভরা হাসি ঠিকরে পড়ে। বন্ধুর বাড়িতে আরও পাঁচ-সাত দিন কাটিয়ে এলেই পারতে। শরীর-মন দুই জুড়োত।

সুকুমারের ইচ্ছে হয়েছে সেই মুহূর্তেই সে আবার ফিরে যায় হাওড়া স্টেশনে। যে কোনো গাড়ীতে উঠে পড়ে, চলে যায় যেদিকে খুশি।

সুকুমার জানে। মুক্তি অনুশ্রী নিতে পারে না। সুকুমারই কি দিতে পারে? অনুশ্রী চলে গেলে তার পায়ের তলা থেকে পৃথিবী সরে যাবে। শরীর আর মনের অভ্যাস হয়ে গেছে যে, অনুশ্রীহীন নিজের অস্তিত্ব সে কল্পনাই করতে পারে না।

তার বন্ধন ওই খুকু। ওই ছ'বছরের মেয়েটা।

মা আর বাবা—কাউকে ছেড়ে সে থাকতে পারে না। মা'র চোখে জল দেখলে সে মুছিয়ে দিতে আসে, বাবার মুখ গম্ভীর দেখলে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে দু'হাতে।

সব সময় সে আদর পায়, তা নয়। মা হয়তো খামকা তার পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে বলে, মর্—মর তুই। তুই মরলেই আমি বাঁচি। তা হলেই আমার ছুটি।

খুকু আগে কাঁদত। এখন আর কাঁদে না। দুটো জলভরা চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তার পর সুকুমারের কাছে এসে ডাকে: বাবা।

সুকুমার বলে, এখন আমায় বিরক্ত করো না খুকু। খেলা করো গে—যাও।

খুকু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ছোট টিনের বাক্সটা খুলে তার খেলার সরঞ্জাম নিয়ে বসে।

গোটাকয়েক ন্যাকড়া আর সেলুলয়েডের পুতুল, মা'র ব্লাউজ আর শাড়ীর কয়েকটা টুকরো, কয়েক ছড়া পুঁতির মালা আর একটা লাল বল সামনে ছড়িয়ে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে। কী যে ভাবে সে-ই জানে।

অনুশ্রী হঠাৎ জ্বলন্ত চোখে তাকায় সুকুমারের দিকে।

তোমার চালাকি আমি বুঝতে পারি না ভাবছ ?

চালাকি ?—সুকুমার ভুরু কোঁচকায়।

চালাকি নয়তো কী। মেয়েটাকে ছেড়ে এক পা-ও আমি চলে যেতে পারি না, সে তুমি জানো। তাই আমাকে যা মুখে আসে তাই বলো।

অসহ্য বিরক্তির মধ্যেও হাসি পায় সুকুমারের। খুকুর জন্যেই কি চলে যেতে পারে না অনুশ্রী ? শুধু খুকুর জন্যেই ?

শীতল শান্ত গলায় সুকুমার বলে, বেশ তো, খুকুকে নিয়েই তুমি আলাদা হয়ে যাও।

যেতেই তো চাই। কিন্তু তাতেও তুমি বাদ সেধেছো। কী মন্ত্রে মেয়েকে বশ করেছ সে তুমিই বলতে পারো। তোমার কাছ ছাড়া করলে একটা দিনও ওকে বাঁচাতে পারবো না। তুমি আমাকে মারবে, মেয়েটাকেও মারবে।

দু'ধারী তলোয়ার। কোনোদিকেই পরিত্রাণ নেই। সুকুমার চুপ করে থাকে।

সত্যি খুকুই সব চেয়ে বড় বাধা। রাত্রে ঘুমের ঘোরে একবার বাবাকে খোঁজে—একবার মা-কে। বুকের ওপর তার ছোট নরম হাতখানা চেপে ধরে সুকুমার ভাবে, খুকুর জন্যেই তাকে বাঁচতে হবে, প্রতিদিনের বিষ নীলকণ্ঠের মতো পান করেও বেঁচে থাকতে হবে।

আত্মহত্যার চেষ্টা কি করে নি ? সে ব্যবস্থাও হয়েছিল একদিন। একটা ঘুমের ওষুধ সে সংগ্রহ করেছিল, যার গোটা ছয়েক ট্যাবলেট একসঙ্গে খেলে ঘুম আর কোনোদিন ভাঙবে না। ছোট টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে আনুষ্ঠানিক চিঠিটা পর্যন্ত লিখে ফেলেছিল : আমার মৃত্যুর জন্যে কেহ দায়ী নয়—ইত্যাদি। তার পর এক গ্লাস জল নিয়ে যখন সে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলেছিল, সেই সময় খুকু কেঁদে উঠল ঘুমের ঘোরে।

বাবা, কোথায় যাচ্ছ ? আমিও যাব।

এমন তো কতদিন বলেছে খুকু। সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্যে কেঁদেছে, বায়না ধরেছে। কিন্তু আজ এই কান্না সম্পূর্ণ একটা নতুন অর্থ নিয়ে এল সুকুমারের কাছে—যেন একটা তীর এসে তার বুকে বিঁধল। সুকুমার দেখল টেবিল ল্যাম্পের ফিকে নীল আলোয় খুকুর মুখ কী পাণ্ডুর, কী করুণ হয়ে গেছে। চোখের কোণে চিকচিক করছে জলের রেখা।

সুকুমার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চিঠিটা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ছড়িয়ে দিলে বাইরে। ঘুমের ওষুধটা লুকোল টেবিলের টানার ভেতরে। ক্লান্ত হতাশায় গ্লাসের জলটা নিঃশেষ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

বন্ধুবান্ধবের মধ্যে দু'একজন যারা ব্যাপারটা জানে, তারা উপদেশ দিতে চেষ্টা করে।

ব্যাপারটা মিটিয়ে দাও না হে, যা হোক একটা কম্‌প্রোমাইজ করে ফেলো। এভাবে রাতদিন স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে কেউ বাঁচতে পারে নাকি!

বর্ণহীন হাসি হাসে সুকুমার।

তাই তো ভাবছিঃ অরণ্যং তেন গন্তব্যং। এবার বানপ্রস্থই নেব, বাসা বাঁধব সুন্দরবনে গিয়ে।

তাতে সুবিধে হবে না। এটা সত্যযুগ নয়, একালে জঙ্গলের মালিক গভর্নমেণ্ট। বনে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট ট্রেসপাস্ কিংবা পোচিং-এর দায়ে থানায় চালান করে দেবে। ওসব মতলব ছাড়ো। একটা রফা করো স্ত্রীর সঙ্গে।

রফা? কিন্তু কোনখানে রফা করবে সুকুমার? এমন তো বড় কোনো ঘটনা ঘটে নি, যার জন্যে স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে এই মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছে; এমন তো স্পষ্ট কোনো কারণ ঘটে নি —যে জন্যে এ ওকে ভুল বুঝতে পারে। এই বিদ্বেষ তার অঙ্কুর পেয়েছে অবচেতনার কোন্ অন্ধকার মৃৎকক্ষ থেকে, সহস্র মূল কোনো জটিল গুল্মের মতো এ নিজের বিষরস আহরণ করছে

সংসারের অগণিত তুচ্ছ বস্তু থেকে। একে উৎপাটিত করবার কোনো উপায় নেই, নিজেকে উপ্‌ড়ে ফেলবার আগে পর্যন্ত এর পাশবন্ধন সুকুমারকে মুক্তি দেবে না।

দূরে চলে যাওয়ার উপায় নেই—অনুশ্রীর ঘৃণা জর্জরিত অথচ অন্ধ ভালোবাসা তাকে দুর্নিবার টানে চক্রপাকের মধ্যে নিয়ে আসবে ; মরবার শক্তি নেই, খুকুর ডাক শোনা যাবে পেছন থেকে, তার শীর্ণ করুণ মুখের ওপর টেবিল ল্যাম্পের নীল আলো কী বিষাদের মতো জড়িয়ে ধরবে তাকে!

আর এইভাবেই বাঁচতে হবে সুকুমারকে। আরও পঁচিশ বছর, ত্রিশ বছর—হয়তো আরও বেশি। এবং খুব সম্ভব, সুকুমার পাগল হয়ে যাবে না। চাকরি করবে, বাজার করবে, সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করবে—নিজে রসিকতা করে অন্যকে হাসাবে এবং অন্যের রসিকতায় পাগলের মতো হেসে উঠবে!

আশ্চর্য!

মানুষ বাঁচে কেন ?

এই দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর জেনেছে সুকুমার। অভিনয় করবার জন্যে।...

...দরজার গোড়ায় প্রায় দশ মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে সুকুমার সুইচ্‌টা টেনে দিলে। ঘরের দেওয়ালে, ছবির কাচে, ড্রেসিং টেবিলের আয়নার আলোটা হঠাৎ জ্বলে উঠল খানিক আগুনের মতো। অনুশ্রী ফিরে চাইল একবার, তার পরেই দু'হাতে চোখ আড়াল করে আবার মুখ ফিরিয়ে বসল জানালার দিকে।

জবাব পাবে না জেনেও অভ্যাস রক্ষার জন্যে সুকুমার বললে, শরীর ভালো নেই ?

অনুশ্রী চোখ ঢেকে বসে আছে। আকাশটাও বোধ হয় আর দেখতে পাচ্ছে না এখন। একরাশ কালো মেঘ জমা হয়েছে সেখানে। মুক্তির নীল বিস্তার আর নেই, এখন মনের ভার বজ্র-বিদ্যুৎ-বর্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে।

বুঝতে কিছুই বাকী নেই। ছোট্ট একটা কোনো উপলক্ষ হয়তো ঘটেছে। হয়তো চিঠি এসেছে একখানা, হয়তো বাসায় কোনো আত্মীয় কয়েক মিনিটের জন্যে পদক্ষেপ করেছিলেন। কিংবা কিছুই ঘটে নি—সামনের আকাশটার মতো আপনিই মেঘ এসে জমাট বেঁধেছে। আজ আর বাইরে থেকে উপকরণের দরকার হয় না, মনের বিষগ্রন্থি আপনিই লালা ক্ষরণ করে।

মধ্যযুগের নাইটদের মতো ধীরে ধীরে আসন্ন যুদ্ধের জন্যে তৈরী হল সুকুমার। বর্ম-পরা কিংবা ঘোড়া সাজাবার দরকার ছিল না, তার বদলে জামাটা খুলে ব্র্যাকেটে রাখল, হাত ঘড়িটা খুলে রাখল ড্রেসিং টেবিলের ওপর, ট্রাউজার ছেড়ে একটা আধ-ময়লা ধুতি জড়িয়ে নিলে লুঙ্গির মতো, তার পর সস্তার একটা আধপোড়া বর্মা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে নিজেকে এলিয়ে দিলে ইজি চেয়ারে।

বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়েও সব টের পাচ্ছিল অনুশ্রী। অথবা টের পাওয়ার দরকার ছিল না। প্রত্যেক দিনের এরা বাঁধা নিয়ম। ঘড়ির কাঁটার মতো এক পথ ধরেই চলে। আট বছরে এ-সব মুখস্থ হয়ে গেছে অনুশ্রীর।

সুকুমারই যুদ্ধের সূচনা করল।

কথা বলছ না যে?

অনুশ্রী ছ'চোখে বিদ্যুৎ জ্বেলে মুখ ফেরালো আবার।

কী অপরাধ করেছি তোমার কাছে যে একদণ্ড চুপ করে বসে থাকতে দেবে না?

অপরাধের কথা হচ্ছে না।—চুরুটটা যেমন বিস্বাদ, তেমনি কড়া—সুকুমারের গলা জ্বলতে লাগল। সেই জ্বালাটার স্বাদ নিতে নিতে বিকৃত মুখে সুকুমার বললে, চুপ করে বসে থাকারও একটা ধরণ আছে।

তুমি কি গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে চাও?

ঝগড়া করতে চাই না। কারণটা জানতে চাইছি।

কারণ কিছু নেই।—চাপা নিষ্ঠুর গলায় অনুশ্রী বললে, আমার ভালো লাগছে না—তাই চুপ করে আছি। তাতে তোমার কি খুব অসুবিধে হচ্ছে? বলো তা হলে, আমি ছাদে চলে যাচ্ছি।

পীড়িত স্নায়ুগুলো আরও জর্জরিত হয়ে উঠছে সুকুমারের। গলায় অসহ্য লাগছে চুরুটের ধোঁয়াটা। কেউ যেন উত্তপ্ত শিসের মতো খানিকটা তরল ধাতু ঢেলে দিচ্ছে সেখানে। সারা দিনের ক্লান্তির পরে মানুষ বাড়ি ফিরে আসে শান্তির আশায়, আশ্রয়ের সন্ধানে। এই তার আশ্রয়, এই তার শান্তি। সুকুমার দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

খানিক চুপচাপ। কয়েকটা উত্তেজিত দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ল সুকুমারের।

অনুশ্রী বললে, হাত-মুখ ধুয়ে তোমার খাবারটা খেয়ে নাও। টেবিলেই ঢাকা দেওয়া আছে। আমি চা করে দিচ্ছি উনুন ধরিয়ে।

সুকুমার বললে, আমি খাব না। আমার খিদে নেই।

বেশ, খেয়ো না তা হলে।—নিরাসক্ত ভঙ্গিতে কথাটা বলে আবার বাইরে চোখ মেলে দিলে অনুশ্রী।

সাড়ে ন'টায় সেই দু'মুঠো খেয়ে অফিসে বেরিয়েছে। সারা দিন গেছে ঘাড়ভাঙা কাজের চাপ। বাড়িতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে এইভাবে আপ্যায়ন না করলে কী ক্ষতি হত অনুশ্রীর? অন্ততঃ আধ ঘণ্টার জন্যে একটু স্বাভাবিক, একটু স্নিগ্ধ হতে তার কী বাধা ছিল? মনের ভেতরে যত ভারই জমে থাক, কিছুক্ষণের জন্যে সামান্য একটু অভিনয়ও সে কি করতে পারত না? একটুখানি খাবার, এক গ্লাস জল, এক পেয়ালা চা—সহজভাবে এগিয়ে দিলেই সুখী হত সুকুমার। এর বেশি দাবি তার আজকাল আর নেই—বেশি দাবি করবার উৎসাহও না।

কিন্তু কী সংকীর্ণ—কী নির্মম হয়ে গেছে অনুশ্রী। একবারও জিজ্ঞাসা করল না—কেন খাবে না, কি জন্যে খিদে নেই। সুকুমারের কাছ থেকে আজ সে এত দূরে সরে গেছে যে, একটুখানি সাধারণ

সৌজন্যও সে রাখতে চায় না। এই প্রাণহীন শীতল বরফের পিণ্ডকে বুকের ওপর সে কতদিন বয়ে চলবে আর ?

চুরুটটাকে ঘরের কোণায় ছুঁড়ে দিয়ে সুকুমার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

আমি একটু বেরুচ্ছি।

চা খাবে না ?

না, প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

কোথায় যাচ্ছ ?—এবার অনুশ্রী উঠে দাঁড়ালো। তার মনের সম্পূর্ণ চেহারটা যেন ফুটে উঠেছে মুখের আয়নায়। স্নেহ মায়া, কোমলতা—কোনো কিছুর চিহ্ন নেই সেখানে। সব প্রাগৈতিহাসিক, সমস্ত জান্তব।

নিজের মুখ দেখতে পেলো না সুকুমার, কিন্তু তার রূপও অজানা নেই। দুটো অন্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি এখন। কে কাকে কতখানি ক্রূর আর কুটিল আঘাত দিতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা

চাপা গলায় সাপের মতো গর্জন করে সুকুমার বললে, যেখানে খুশি। এ ঘরে আর কিছুক্ষণ বসে থাকলে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। খানিকক্ষণ পথে পথে ঘুরে আসব।

সুকুমার বেরিয়ে যাচ্ছিল, অনুশ্রী এসে দরজা আটকে দাঁড়ালো।

একটা কথা শুনবে ?

দাঁতে দাঁত চেপে সুকুমার বললে, বলো।

রোজ এমনভাবে সিন ক্রিয়েট করে লাভ কী ?—অনুশ্রীর শরীরটাও যেন ফণা তোলা সাপের মতো দুলতে লাগল অল্প অল্প : আমার জন্যেই নিজের ঘরে এসেও তুমি এক মুহূর্তের জন্যে শান্তি পাও না। আমিই চলে গেলে কেমন হয় ?

ঠিক তক্ষুনি পার্ক থেকে বেড়িয়ে ফিরে এল খুকু। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলো সব। সেই প্রতিদিনের পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হয়েছে। বাবা এখন তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, মাকে সে আর চিনতে পারছে না। একরাশ প্রবল কান্নাকে

কোনোমতে সামলে নিলে খুকু—তার পর নিঃশব্দে সরে গেল ছায়ার মতো।

সুকুমার দেখতে পেলো খুকুকে—কিন্তু খুকুর কথা ভাববার মতো মনের অবস্থা তার নয়। তখনো অনুশ্রী ফণা তোলা সাপের মতো দুলছে তার সামনে।

কী বলো তুমি? আমি চলে গেলে কেমন হয়?

এ-কথা এর আগেও অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে অনুশ্রী, সুকুমার জবাব দেয় নি। কিন্তু আজ আর নিজের রাশ সে টেনে রাখতে পারল না। হাতের মুঠোয় রাখা দেশলাইটা আঙুলের চাপে মটমট করে উঠল। সুকুমার বললে, ভালোই হয়—খুব ভালো হয়। তুমি মুক্তি পাও—আমিও নিস্তার পাই এই নরক যন্ত্রণা থেকে।

বারুদের পলতেয় ওইটুকু আগুনের জন্যেই যেন প্রতীক্ষা করছিল অনুশ্রী। চক্ষের পলকে মট করে ভেঙে ফেলল হাতের শাঁখা জোড়া—হাড়ের টুকরোর মতো তারা মেজের ওপর ঝরে পড়ল। তার-পর পাগলের মতো আঁচলের প্রান্তে সিঁথির সিঁদুর ঘষে তুলতে তুলতে বললে, বেশ, তোমাকে নিস্তার আমি দিচ্ছি। ইচ্ছে হয় লিগ্যাল সেপারেশনের জন্যে কোর্টে দরখাস্ত করতে পারো—না করলেও ক্ষতি নেই। আর এক্ষুনি তোমার বাড়ি থেকে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।

সুকুমারের হাতের মুঠোয় দেশলাইটা গুঁড়িয়ে গেল। অন্ধ জিঘাংসায় কাঠিগুলোকে ছুড়ে ছড়িয়ে দিলে ঘরময়! এই মুহূর্তে একটা বীভৎস রকমের কিছু সে করে বসতে পারে। হাতের সামনে একটা খোলা ক্ষুর পেলে বসিয়ে দিতে পারে নিজের গলায়, একটা হাতুড়ি পেলে তাই দিয়ে একঘায়ে নিজের মাথাটাকেই চুরমার করে দিতে পারে।

থরথর করে কাঁপতে লাগল সুকুমার। কোনো কথা বলতে পারল না।

একটানে একটা সুটকেস নামিয়ে আনল অনুশ্রী। ডালা খুলে

ভেতরের যা কিছু উবুড় করে ফেলল। ঝন্‌ঝন্‌ করে টুকরো-টুকরো হল একজোড়া চায়ের পেয়ালা।

তবুও কথা বলল না সুকুমার। কিছু বলবার চেষ্টা করলে এখন কেবল চিৎকার বেরিয়ে আসবে একটা। সে চিৎকার মানুষের নয়।

আলনা থেকে কতগুলো শাড়ী, ব্লাউজ টেনে নিয়ে তালগোল পাকিয়ে সুটকেসে ভরে ফেলল অনুশ্রী।

আমি খুকুকে নিয়ে এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।

বার কয়েক ঠোঁট দুটো কাঁপবার পরে সুকুমার বোবা ধরা আওয়াজে বললে, না, খুকু থাকবে আমার কাছে।

খুকুকে রাখতে চাও?—রহস্যময় বিচিত্র হাসি হেসে অনুশ্রী বললে, বেশ, তাই রাখো। ও মায়ায় আমায় আর বাঁধতে পারবে না। সব সম্পর্ক চুকিয়েই আমি চলে যাব।

এতক্ষণের মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ থেকে এইবারে বৃষ্টি নামল। ঝমঝম করে নামল।

দাঁতে দাঁত ঘষে সুকুমার বললে, যাওয়ার আগে ওয়াটারপ্রুফটা নিয়ে যেয়ো! বৃষ্টি পড়ছে।

ঠাট্টা করছ?—অনুশ্রী পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল: ওয়াটার-প্রুফের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমার আর উপকার করতে হবে না। ঝড়ের মধ্যেই যখন বেরিয়ে পড়েছি—তখন এটুকু বৃষ্টিতে আমার কিছু আসে-যায় না।

একটা তীব্র নীল দ্যুতিতে ড্রেসিং টেবিলের কাচ, অনুশ্রীর রক্ত-হীন হিংস্র মুখ আর ঘরের চারটে সাদা দেওয়াল একসঙ্গে উদ্ভাসিত হল। বিকট শব্দ তুলে বাজ পড়ল কাছাকাছি কোথাও।

আর অনুশ্রী বললে, শুধু যাওয়ার আগে খুকুকে একবার দেখে যাব। বৃষ্টিতে খুকু হয়তো পার্কের কোনো ছাউনির নিচে দাঁড়িয়ে আছে। সেইখানেই তাকে বলে যাব—তার মা মরে গেছে।

আবার খানিকটা নীল দ্যুতি ঘরের মধ্যে লকলক করে গেল। প্রচণ্ড শব্দে বজ্র পড়ল আবার।

তখন সুকুমারের মনে পড়ল।

খুকু ফিরে এসেছে।

ফিরে এসেছে?—হঠাৎ মুখের চেহারা বদলে গেল অনুশ্রীর: তবে গেল কোথায় খুকু? এখন মেঘ ডাকছে—বাজ পড়ছে—খুকু কোথায়? খুকু—খুকু—

খুকুর সাড়া এল না।

অনুশ্রী ছুটে বেরিয়ে এল। খুকু বারান্দায় নেই, বসবার ঘরে নেই, রান্নাঘর, কলঘর, কোথাও নেই।

সমস্ত ভুলে গিয়ে অনুশ্রী শক্ত করে সুকুমারের হাত চেপে ধরল। তার পর আরও উন্মত্ত, আরও উদ্‌ভ্রান্ত গলায় চেঁচিয়ে বললে, বলো, আমার খুকু কোথায়? বলো—সে কোথায় গেল?

সুকুমারের কপালের দু'ধারে রক্তের চাপে রগ দুটো প্রায় ফেটে যেতে চাইছে—হৃৎপিণ্ডটা ফুলে উঠতে চাইছে বেলুনের মতো। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সুকুমার বললে, ব্যস্ত হয়ো না, আমি দেখছি।

প্রায় তিন লাফে কুড়ি বাইশটা সিঁড়ি পার হয়ে সুকুমার ছাদে উঠে এল।

তীরের মতো বৃষ্টি পড়ছে। কালো কবন্ধ আকাশ থেকে বিদ্যুতের ঝিলিক। চশমার কাচ আবছা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে থেকে তার পর সুকুমার দেখতে পেলে।

গঙ্গা জলের ড্রামটার ঠিক পাশেই। একটি ছোট মানুষ লুটিয়ে পড়ে আছে। গোলাপী ফ্রকটা লেপটে গেছে গায়ের সঙ্গে আর ছোট্ট মাথাটির কালো চুলগুলি জলের একটা স্রোতে যেন ভাসছে।

খুকু! —বুকফাটা আর্তনাদ করে ছুটে গেল সুকুমার। দু'হাত দিয়ে খুকুকে তুলে নিলে বুকের ভেতর। ছোট শরীরটা ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে গেছে—মাথাটা সুকুমারের কাঁধের ওপর ভেঙে পড়ল।

আবার আর্তনাদ করে সুকুমার ডাকল: খুকু!

ততক্ষণে অনুশ্রীও ছুটে এসেছে ছাদে। মাথার চুল খোলা,

আঁচল লুটিয়ে পড়েছে—বাঘিনীর মতো ছুটে এসে সুকুমারের বুক থেকে খুকুকে টেনে নিলে।

একি! এ যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। খুকু-খুকু। ওগো—খুকু কথা কইছে না কেন? খুকুর কী হল?—অনুশ্রী হাহাকার করে উঠল।

একটু আগেও সংযম হারায় নি সুকুমার—এখনো হারালো না। সংক্ষেপে বললে, অজ্ঞান হয়ে গেছে। চলো—নিচে নিয়ে চলো শিগ্‌গীর।

ডাক্তার ওষুধ দিয়েছেন, ইনজেকশন দিয়েছেন, ভরসা দিয়ে গেছেন। কিন্তু ভরসা নেই স্বামী-স্ত্রীর। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে খুকুর, মুখ টকটকে লাল। মাথার কাছে অনুশ্রী, আর বিছানার পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে রাত জাগছে সুকুমার।

দুটো আরক্ত বিহ্বল চোখ মেলল খুকু। শূন্য দৃষ্টি ফেলে কী যেন দেখছে।

অনুশ্রী ডাকল: খুকু—

খুকু জবাব দিল না। ভীত অস্বাভাবিক চোখে তখনো কী যেন খুঁজছে সে।

সুকুমার খুকুর জ্বরতপ্ত কপালে হাত রাখল। তীব্র উত্তাপে শিউরে উঠল শরীর।

খুকু-খুকু—

খুকু কথা কইল। বিড়বিড় করে বললে, যাব না, আমি ঘরে যাব না—

খুকু-মা আমার, মাণিক আমার—অনুশ্রী কাঁদছে।

খুকু প্রলাপ বকতে লাগল: যাব না, আমি ঘরে যেতে পারব না। কেন রাতদিন ঝগড়া করো তোমরা? কেন বাবা না খেয়ে অফিসে যায়? কেন মা এমন করে কাঁদে? আমি যাব না—

নিঃশ্বাস ফেলে খুকু পাশ ফিরল।

বাইরে ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। বজ্র বৃষ্টি আর নেই এখন,

আকাশের কান্নার পালা চলছে। দীর্ঘশ্বাসের মতো হাওয়া এসে শব্দ তুলছে জানলার খড়খড়িতে।

সুকুমার অনুশ্রীর দিকে তাকালো। কোমল গলায় ডাকল, অনু।

অনুশ্রী জল-ভরা চোখ তুলল।

খুকুর গায়ের ওপরে রাখা অনুশ্রীর হাতখানা মুঠো করে ধরল সুকুমার। আস্তে আস্তে বললে, এ আমরা কী করেছি অনু? আমাদের পাপের দণ্ড এ কাকে বইতে হচ্ছে?

সেই বজ্র, সেই বিদ্যুতের উদ্ভাস মুহূর্তে একটা নগ্ন নিষ্ঠুর সত্যকে উদঘাটন করে দিয়েছে। দু'জনের সমস্ত বিষ অঞ্জলি পেতে তিলে তিলে নিয়েছে খুকু—সেই বিষের জ্বালায় এই ছোট মেয়েটাই নীলকণ্ঠ হয়ে গেছে। অন্ধ, অর্থহীন মনোবিকারে আচ্ছন্ন চোখ নিয়ে ওরা কেউ এতদিন তা টেরও পায় নি। বুঝতেও পারে নি, দিনের পর দিন ওরা কেমন করে সবচেয়ে নিরপরাধকে সবচেয়ে নির্মমতার আঘাতে জর্জরিত করে তুলছে।

অনু, এবার আমাদের প্রায়শ্চিত্তের পালা।—অনুশ্রীর হাতে চাপ দিয়ে আবার ক্লান্ত, কোমল গলায় বললে সুকুমার।

অনুশ্রী জবাব দিল না। জবাব দেবার দরকারও ছিল না। সুকুমারের হাতের ওপর টুপ্ করে এক ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ল, অনুশ্রী সমস্ত অনুতাপ, সমস্ত বেদনা আর সমস্ত মমতা মাখানো গলায় প্রার্থনার মতো উচ্চারণ করল: খুকু—আমার মা—আমার মা-মণি—

অন্ত্যেষ্টি

একজন অভিনেতা মারা গেছেন। তাঁর শোকযাত্রা এসে পৌঁছেছে নিমতলায় শ্মশানে।

অবশ্য মৃত্যুর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। ওটা চিরদিন ঘটে এসেছে, চিরদিনই ঘটবে এবং আজকে যিনি মারা গেছেন তিনি অভিনেতার আদর্শ মৃত্যুই বরণ করেছেন।.

অর্থাৎ কয়েক বছর আগে খ্যাতি আর গৌরবের শিখরে উঠেছিলেন তিনি। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কোনো না কোনো সিনেমা সাপ্তাহিকে তাঁর ছবি বেরুত, তিনি কোন্ হোটেলে খেতে ভালোবাসেন কিংবা কোন্ দরজীর দোকানে স্যুট তৈরি করান তার বিশদ বিবরণ থাকত। তার পর একদিন জানা গেল, তাঁকে আর 'পাবলিক' চায় না—তার আর বক্স অফিস নেই। রোজগার কমে আসতে লাগল—এখন আর কনট্রাক্ট্ ফেরত দিতে হয় না, কনট্রাকটের জন্মেই ঘোরাঘুরি করতে হয়। এর মধ্যে শরীরে ভাঙন শুরু হয়েছে—লিভারে প্রায়ই ব্যথা উঠতে আরম্ভ করে দিয়েছে। অভিনেতা বিছানা নিলেন। অভিজাত মহলের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আস্তানা নিলেন প্রায় বস্তির ঘরে। দু'চারজন সমব্যথী বন্ধু যখন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে এলেন, তখন আর করবার মতো বিশেষ কিছু অবশিষ্ট ছিল না। স্ত্রী এবং ছুটি নাবালক ছেলেকে পথে বসিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় ভদ্রলোক মারা গেলেন।

একেবারে ফরমূলা মাফিক মৃত্যু। জ্যামিতির সিদ্ধান্ত!

শ্মশানঘাট লোকে লোকারণ্য। কম করেও হাজার খানেক লোক ভেঙে পড়েছে ভেতরে। বাইরে দাঁড়িয়ে আরও হাজার দশেক। একটা প্রবল কোলাহল উঠছে। ভেতরে খবরের কাগজের লোক ঘুরছে। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ চমকে উঠছে দিনের আলোতেই।

অটোগ্রাফের খাতা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাসির আওয়াজ উঠছে থেকে থেকে—শ্মশানের অভ্যস্ত গন্ধ ছাপিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে দামী সিগারেটের ধোঁয়া। যেন উৎসবের একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে চারদিকে।

অভিনেতা কি জানতেন—মৃত্যুর পরে এমন বিপুল সম্বর্ধনা জুটবে তাঁর কপালে? জীবনের শেষ ছ'মাস মাত্র দু'একটি নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া তাঁর পাশে কেউ এসে দাঁড়ায় নি—শেষ-কৃত্যের এ সময় সৌভাগ্য তিনি কি কল্পনাও করেছিলেন?

অভিনেতার আজ আর চোখ মেলে চাইবার উপায় নেই। অন্ধকার কালো কোটরের ভেতরে, বিবর্ণ পাতার ছায়ায়, তাঁর দৃষ্টি চিরদিনের মতো মুছে গেছে। নইলে চারদিকে তাকিয়ে তিনি হয়তো প্রচণ্ড কৌতুকে হা-হা করে হেসে উঠতেন একবার।

দশ হাজার লোকের ভিড় জমেছে তাঁর জন্যে নয়।

তাঁর শোক-যাত্রায় পায়ে হেঁটে এসেছেন চিত্র গগনের অনেক চন্দ্র-সূর্য-তারা। মোটরে চেপে পেছনে পেছনে এসেছেন চিত্তহারিণী চিত্র-নায়িকার দল। এতগুলো মানুষ জড়ো হয়েছে তাঁদেরই দর্শন-লাভের আকাঙ্খায়। কেউ কেউ অটোগ্রাফ নেবে—একটু দুঃসাহসী যারা, তাদের ফটো তোলবারও বাসনা রয়েছে মনে মনে।

রাশি রাশি ফুল দিয়ে সাজানো শব নামানো রয়েছে একপাশে। কে যেন একটুখানি চন্দনও পরিয়ে দিয়েছে গালে-কপালে। একদার রাজপুত্র। প্রেমের দৃশ্যে তাঁর অভিনয় দেখে হাততালিতে ফেটে পড়ত প্রেক্ষাঘর। বীরবেশে ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি যখন চলে যেতেন, তখন অনেক তরুণীই তাদের বুকের ভেতর অনেকক্ষণ ধরে সেই ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেত।

আজ সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। বিবর্ণ, জরাজীর্ণ চেহারা। কোনো এক নিতান্ত নগণ্য 'হরিপদ কেরানীর' সঙ্গে তাঁর মৃতদেহ বদল করে নিলেও সে পার্থক্য সহজে ধরা পড়বে না লোকের চোখে।

একজন অভিনেত্রীর চোখ ছল-ছল করে উঠল। তাঁর ভাগ্যে এখন তুঙ্গী বৃহস্পতি চলছে।

ইস্-স্স—কী চেহারা হয়ে গেছে ওঁর। চেনাই 'মুশ্‌কিল'।

পাশ থেকে একজন মাঝারি অভিনেতা চাটুকারের মতো মাথা নাড়লেন, 'সত্যি! না বলে দিলে যেন বোঝাই যায় না।'

অভিনেত্রী কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মৃতের মুখের দিকে।

'আমার প্রথম বইতে ওঁর এগেনস্টে আমি নেমেছিলুম। উঃ—কী ম্যান্‌লি চেহারা—কী ফর্ম! আমি তো সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় কেঁপে-ঝেঁপে অস্থির, ডায়ালগ বলা দূরের কথা! মনে আছে একটা শটে পর পর চারটে এন্-জি করেছিলুম। ভাবতে পারা যায়—এ সেই লোক?'

মাঝারি অভিনেতা বললেন, 'যা বলেছেন! তবে ব্যাপারটা কী জানেন? সেই যে, যে জন দিবসে মনের হরষে—আর কি! আমরা কতবার বুঝিয়েছি, অত খাবেন না—সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে। উত্তরে বলত কী, জানেন? আমি বামুনের ছেলে—অগস্ত্যের বংশধর। চুমুক দিয়ে সমুদ্র শেষ করলেও কিছু হবে না আমার।'

একটা কথা চেপে গেলেন তিনি। মৃত-মানুষটির দৌলতে বিনা পয়সায় বিস্তর নেশা তিনিও করেছেন—হোটেল থেকে মনিব্যাগ শূন্য করে বেরিয়ে আসার সৎকাজে ভদ্রলোককে তিনিও কম সহযোগিতা করেন নি।

অভিনেত্রী বললেন, 'চলুন হাবুলবাবু, এখানে আর নয়। বড্ড বিশ্রী লাগছে।'

এদিক ওদিক নানা ছোটখাটো দলে জটলা চলছে। আর একজন নামকরা অভিনেত্রী হঠাৎ দেখা পেয়ে গেছেন তাঁর এক ভূতপূর্ব প্রোডিউসারের। চার দিনের প্রো-রেটার টাকা মেরে দিয়েছেন প্রোডিউসার—বহুদিন চেষ্টা করেও অভিনেত্রী তা আদায় করতে পারেন নি—দেখাই পান নি লোকটির। আজকে জায়গা মতো পেয়ে চেপে ধরেছেন।

'ওকি মিস্টার চাক্‌লাদার, পালাচ্ছেন কেন চোরের মতো? আমাদের বুঝি চোখেই দেখতে পান না আজকাল?'

ধরা পড়ে পাংশু হয়ে গেছে মিস্টার চাক্‌লাদারের মুখ। তবু সেই অবস্থাতেই খানিক বিনয়-বিগলিত হাস্য করলেন তিনি।

'কী যে বলেন, আপনাদের দেখতে পাইনে। বাপ্‌রে। হু' চোখ জুড়ে আপনারাই তো বিরাজ করছেন।'

'লক্ষণ দেখে তা তো মনে হচ্ছে না। সুট্ করে পাশ কাটিয়ে পালাচ্ছিলেন—'

'পা-পা-পালাই নি তো'—চাক্‌লাদার কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করলেন: 'সত্যি বলছি গায়ত্রী দেবী, ভাবলুম আপনি এঁদের সঙ্গে কথা কইছেন, তাই আর বিরক্ত করব না।'

কাচভাঙার মতো আওয়াজ তুলে তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর গলায় গায়ত্রী দেবী হেসে উঠলেন।

'কিন্তু আপনারা মাঝে মাঝে বিরক্ত করলে আমরা যে বেঁচে যাই। সেই 'প্রাণে-প্রাণের' টাকাটা—'

চাক্‌লাদার এবারে একদম স্তব্ধ। তার পরে খানিক কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, 'আমার নতুন ছবিটা রিলিজ করলেই দিয়ে দেব—সত্যি বলছি! পর পর দু'খানা বই মার খেলো, বড্ড টাইটে পড়েছি এখন—'

আর এক পাশে একজন ছোকরা ডিরেক্টার দাঁড়িয়ে ভক্তির অর্ঘ নিচ্ছেন। তাঁর নতুন ছবিখানা 'সুপারহিট্' হয়েছে—কয়েকজন চেপে ধরেছে তাঁকে।

একজন প্রৌঢ় একস্ট্রা বিধিমতো তোয়াজ করছেন। একস্ট্রাটি কুড়ি বছর এ লাইনে ঘোরাঘুরি করছেন, স্ত্রীর গয়না বেচে বহু ডিরেক্টারকে খাইয়েছেন, কিন্তু কখনো কোনো বইতে পাঁচটার বেশি ডায়ালগ পেলেন না। ফিল্ম-লাইনের তিনি সর্বজনীন মামা।

মামা বলে চলেছেন, 'বুঝলে হে প্রদোষ—এ বয়সে অনেক ডিরেক্টারই তো চরালুম। কিন্তু হক কথা বলতে কি, তোমার

এই নতুন ছবিতে অনেক জাঁদরেল মিঞার তুমি কান কেটে নিয়েছ! তাই তো বলি, নিউ ব্লাড্ চাই—চাই নতুন প্রতিভা—'

ডিরেক্টার প্রসন্ন হয়ে একটা আমেরিকান সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। আগে 'চার মিনার' খেতেন, বলতেন, ওটা নিজাম ব্র্যাণ্ড—হায়দ্রাবাদের অ্যারিস্টোক্র্যাসি। হালে তিনটে বড় বড় কন্ট্রাক্ট পাওয়ার পরে হলিউড্ অ্যারিস্টোক্র্যাসির দিকে পা বাড়িয়েছেন।

'আসুন মামা, সিগারেট নিন্—'

দ্বিতীয়বার বলবার দরকার ছিল না। মামা প্রায় ছোঁ দিয়েই সিগারেট তুলে নিলেন।

'কিন্তু এবার আমাকে একটা বড় পার্ট দিতেই হবে—নইলে ছাড়ছি না। শুনেছি 'মুন শাইন' লিমিটেডের বইটাতে একটা দাদুর পার্ট রয়েছে—ওটা এবার দিয়েই দেখো না আমাকে। নতুন টাইপ করে দেব—বিলিভ মি—'

ডিরেক্টার মৃদু হাসলেন।

'সরি মামা, ওটা অল্‌রেডি মহিমবাবুকে দেওয়া হয়ে গেছে। পার্টি আবার অল্-স্টার-কাস্ট ছবি চায় কিনা! যাই হোক, আপনার কথা মনে রইল। স্টুডিওতে একদিন দেখা করবেন—'

আর-একদিকে একজন দিক্‌পাল অভিনেতাকে ঘিরে ধরেছে একদল অটোগ্রাফ-শিকারী। উদারভাবে তিনি খাতার পর খাতায় সই দিয়ে চলেছেন, বাণীও দিচ্ছেন সেই সঙ্গে।

'বাংলাদেশের ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি? অন্ধকার—তার ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার।'

'তবে কি আপনি বম্বের কথা বলছেন স্যার?'—একটি ভক্তের জিজ্ঞাসা শোনা গেল। দু'বছর আগে পর্যন্ত দিক্‌পাল বম্বের বন্দনায় পঞ্চমুখ হতেন, কিন্তু সম্প্রতি মত বদলেছেন। দু'খানা ছবির কন্ট্রাক্ট নিয়ে বম্বে ছুটেছিলেন, কিন্তু দুটি বই-ই ফ্লপ্

হয়েছে। আর তার পরেই দ্বিগুণ বেগে তিনি ফিরে এসেছেন কলকাতায়—ঈশ্বরেচ্ছায় এখানে তাঁর বাজার আছে এখনো।

চটে গিয়ে দিক্‌পাল বললেন, 'বম্বের ছবি? ট্র্যাশ! যেন পাগলের কারখানা—না আছে মাথামুণ্ডু, না আছে লজিক! ওরাই তো দেশের সর্বনাশ করলে মশাই!'

'কিন্তু ওদের টেক্‌নিক্যাল্ কোয়ালিটি—'

টেক্‌নিক্ সম্বন্ধে কিছু না বুঝলেও কথাটা বলতে হয়—অন্তত এইটেই রেওয়াজ। ভক্ত একটা ভালো কথা বলবার সুযোগটা ছাড়তে পারল না।

'টেক্‌নিক্যাল্ কোয়ালিটি? ই—য়েস!'—দাঁতে চেপে প্রতিধ্বনি করলেন দিক্‌পাল: 'ছাট্‌স্ ট্রু। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানো? উপমা দিয়ে বলি। কোনো পরমা সুন্দরী মেয়ের যদি এক বিন্দুও ব্রেন না থাকে, তা হলে কি রকম দাঁড়াবে? ঠিক তাই—'

গঙ্গার ঘাটে জোয়ারের ঘোলা জল এসে ঘা দিচ্ছে। চিতার একরাশ পোড়া কয়লা ভেসে চলেছে স্রোতে। অভিনেতা দস্তিদার জলের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন দার্শনিকের মতো।

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টার সোমেন এগিয়ে এল তার কাছে।

'কী ভাবছেন দস্তিদারদা?'

'ভাবছি, মরে গেল লোকটা?'

'গেল বই কি।'—সোমেনও উদাস হয়ে উঠল: 'আমাকে বড় ভালোবাসত। হাসপাতালে যখন সেদিন দেখা করতে যাই, আমাকে বলেছিল—তুই ডিরেক্টার হলে তোর বইতে আমাকে একটা রোল্ দিস সোমেন। বলেছিলাম, তুমি আগে সেরে ওঠো দাদা—রোল্ দেব বই কি। উত্তরে বলেছিল, সেরে উঠব বই কি—আমি কি আর চিরদিন পড়ে থাকব এখানে! দেখিস, এবারে ভালো হয়ে সেন্‌সেশন সৃষ্টি করব চারদিকে। কত জিনিস করবার আছে, কিছুই তো করা হল না।'

সোমেনের গলা ভারী হয়ে উঠল। অল্প বয়েস, তাই স্টুডিয়োর

বন্ধ হাওয়ায় আর হাজার হাজার কিলোওয়াটের আলোতেও এখনো তার মনের সবুজ রঙ শুকিয়ে হলদে হয়ে যায় নি।

দস্তিদার দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'না, কিছুই করা হল না।'—এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে দস্তিদার বললে, 'আজকে ওর মরা মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কী মনে হচ্ছে জানিস সোমেন? ওর মতো আমিও একদিন অমনি টপ্‌ করে মরে যাব।'

'ছিঃ ছিঃ দস্তিদারদা!'

'ঠিকই বলছি সোমেন। আমারও প্রায়ই পেটে ব্যথা উঠছে আজকাল—ভালো ঘুম হয় না, খেতে পারি না—'

'ছেড়ে দিলেই তো পারেন। পয়সা খরচ করে কেন নিজের সর্বনাশ ডেকে আনেন?'

'ছাড়তে তো চাই, কিন্তু পারি কই!'—ভূতগ্রস্তের মতো বিহ্বল চোখে চেয়ে রইল দস্তিদার: 'সব বুঝেও তো ফিরতে পারছি না! অথচ বুড়ো মা এখনো বেঁচে আছেন, স্ত্রী ছেলেপুলে! নাঃ, ওর মৃত্যু দেখে আমার শিক্ষা হয়ে গেল। কাল থেকে আর চৌরঙ্গীর রাস্তা মাড়াব না—'

সোমেন জবাব দিল না। দস্তিদারকে সে জানে। আজ সন্ধ্যার পরেই এ শ্মশান বৈরাগ্য মুছে যাবে তার মন থেকে।

ঘাটের ওপাশে আর-একদল আড্ডা বসিয়েছে। একটি কমেডিয়ান, দুটি ছোকরা অভিনেতা, জন দুই টেক্‌নিশিয়ান। একজন বুড়ো প্রোডাকশন ম্যানেজার বসেছেন সভাপতি হয়ে।

কমেডিয়ান একটা বিখ্যাত গানের প্যারডি ধরেছিল, সভাপতি তাকে থামিয়ে দিলেন।

'এই, কী সুর ধরেছিস! শ্মশানে এসেছিস শোক করতে—ওসব ছেলেমানুষী দেখলে লোকে কী বলবে?'

'শোক করার জন্যে বিস্তর লোক জুটেছে দাদা, আমাদের অংশে একটু ঘাটতি পড়লেও কেউ কিছু মনে করবে না। তুমি আর এমন রসের মধ্যে বাগড়া দিয়ো না।'

'আরে, বাগড়া দিচ্ছে কে? অত না চেঁচালেই তো হয়। ত্যাখনা—দস্তিদার কেমন ভাবুকের মতো বসে রয়েছে।'

'শতেক কবুতর খেয়ে দস্তিদার এখন'—একজন বুমম্যান্ যোগান দিলে।

সভাপতি বললেন, 'ছেড়ে দে ওর কথা। হাঁরে, রসের কথা বলছিস, রসের খবর কী রাখিস তোরা? ইতিমধ্যে তোদের পুবালি দেবী কী করেছে জানিস? পরশু প্লেজার হোটেলে—'

সবাই ঘন হয়ে বসল।

'সঙ্গে কে ছিল দাদা? আমাদের সেই 'প্রিন্স' নাকি?'

শুধু প্রিন্স? সেই সঙ্গে আরও জন দুই পাঞ্জাবী কাপ্তেন। সবাই মিলে যা একখানা হুলা হুলা ড্যান্স শুরু হল—'

'খোলসা করো দাদা, খোলসা করো। জমাও—'

ঘাটের ধারে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। যৌবনের সীমান্তে তার বয়েস, প্রায় পাঁচ বছর আগে ফিল্ম-লাইন থেকে বিদায় নিয়েছে সে। বড় পার্টে কেউ তাকে এখন ডাকে না—ছোট পার্টেও নামতে পারে না চক্ষুলজ্জায়। আজকাল প্রায় অনাহারেই তার দিন কাটে।

যে মানুষটিকে আজ শ্মশানে আনা হয়েছে, তার সঙ্গে বহুবার অভিনয় করেছে সে। শুধু অভিনয়ই করে নি, তাকে সে ভালোবাসত। পাঁকের থেকে উঠেছিল—মসৃণ পথ দিয়ে চলার সুযোগ পায় নি, তবু—তবু ওই মানুষটিকে সে জীবনের আকস্মিক আগন্তুক বলেই ভাবতে পারে নি! ওর কাছে যতবার ধরা দিয়েছে তত-বারই মনে হয়েছে যেন সমস্ত গ্লানি মুছে গেছে তার, যেন নিজেকে ওর কাছে উজাড় করে দিয়ে ধন্য হয়েছে সে। যেদিন নেশা কেটে যাওয়ার পরে ও চিরতরে বিদায় নিল, সেদিনও ওর স্মৃতিকে বুকের মধ্যে রেখে পুজো করেছে সে।

টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে মেয়েটির চোখ দিয়ে—দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে।

আর দুটি মানুষ অপেক্ষা করছে কেওড়াতলার শ্মশানে। নিমতলা থেকে অনেক দূরে।

একজন অভিনেতার স্ত্রী। পরনে মলিন লাল পাড় শাড়ী—শীর্ণ হাতে শেষ সম্বল দুটি শাঁখা, এখনো ভাঙা হয় নি—এখনো কপালে সিঁদুরের ফোঁটা জলজল করছে। পাশে শুকনো মুখে বসে আছে চার বছরের ছেলেটি।

বড় ছেলে গেছে শবযাত্রার সঙ্গে।

কথা ছিল শবযাত্রা আসবে কেওড়াতলায়, শেষ পর্যন্ত মত বদলেছেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সে খবর কেউ তাঁদের জানায় নি, হয়তো খেয়ালই হয় নি কারো।

বেলা ন'টা থেকে তাঁরা অপেক্ষা করে আছেন। তাঁদের শোকাতুর-ক্ষুধাতুর পীড়িত চোখের সামনে সমস্ত শ্মশানটা যেন ছায়াবাজির মতো নাচছে। মাথার ওপরে সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে—শ্মশানের ধোঁয়া আর দুর্গন্ধ একটা শ্বাসরোধী আবেষ্টন সৃষ্টি করছে তাঁদের চারদিকে।

বেলা দুটো বেজেছে এখন।

চার বছরের ছেলেটির মাথা ঘুরছে, সে আর থাকতে পারছে না। একবার শুধু ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, বড় খিদে পেয়েছে মা, বাড়ি যাবে না?

মা শুনতে পেলেন না। আর শুনলেই বা কী হত? আজ একটি দানাও খাবার নেই ঘরে।

শেষ পর্যন্ত বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল এন্টালীর দিকটায়।

মনের মতো বাড়ি। অর্থাৎ এরা যেমন চাইছিল ঠিক সেই রকম। তেতলায় তিন ঘরের একটি নতুন ফ্ল্যাট। দক্ষিণ-পুব-পশ্চিম তিনদিকেই খোলা। দক্ষিণ-পুব দু'ধারেই দুটি ছোট বারান্দা রয়েছে। স্নানের ঘর সম্পর্কে ললিতার একটু সৌখিনতা আছে—সেটিও বেশ পছন্দসই, ঝাঁঝরির ব্যবস্থা আছে।

ভাড়া? একেবারে মারাত্মক কিছু নয়। একশো কুড়ি টাকা। একটু কষ্ট হলেও দেওয়া চলবে। তা ছাড়া মাস ছয়েকের মধ্যেই বেশ ভালো একটা লিফ্‌টের আশা আছে শৈলেনের। তখন আর বিশেষ কিছু অসুবিধে হবে না। নাঃ—নিয়েই ফেলা যাক। এমন সুযোগ সহজে আসে না।

ললিতা বললে, দালালকে একশো কুড়ি টাকা দিতে হবে?

শৈলেন বললে, কী আর করা যায়? কথাই তো আছে সেই রকম।

বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে না?

এক মাসের বাড়ি ভাড়া ওঁকে দিতে হবে—সেই রকম চুক্তি ছিল। ভদ্রলোক খেটেওছেন কম নয়।

ললিতা জবাব দিল না। বোঝা গেল, খুশি হয় নি। মাঝখান থেকে কে-একটা লোক এসে এক মুঠো টাকা নিয়ে চলে যাবে, এ ব্যাপারটাকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না।

শৈলেন বললে, তা হোক। ও নিয়ে মন খারাপ কোরো না।

ললিতা শুকনো হাসি হাসল।

মন খারাপ করেই বা কী করব! কথা যখন দিয়েছ, তখন দিতেই হবে।

খোঁচা যে এক-আধটু শৈলেনেরও না বিঁধছিল তা নয়। আপাতত শোকটা ভোলবার চেষ্টায় একটা সিগারেট ধরিয়ে সে বললে, তা হলেও বাড়িটা চমৎকার। একেবারে মনের মতো। আমরা এতদিন ধরে যেমনটি চাইছিলাম ঠিক তাই। বড় রাস্তার কাছে—অথচ ঠিক ওপরে নয়। রাতদিন কানের কাছে বাস ট্রামের ঘড়ঘড়ানি শুনতে হবে না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত রোদ পাওয়া যাবে—রাত্তিরে ঘরে চাঁদের আলো পড়বে, দক্ষিণের বাতাস আসবে।

ললিতা বললে, তা তো আসবে। কিন্তু বাড়িওলা বাড়িতেই থাকে বলছিলে না?

তা থাকে। থাকে দোতলায়। বাড়িওলা নয়—বাড়িউলী।

বাড়িউলী?—ললিতা ভ্রূকুঞ্চিত করলে।

ভদ্র মহিলা বিধবা। ছেলে নেই—আছে গুটি তিনেক মেয়ে। একতলা তেতলা ভাড়া দেন—ওই ভাড়ার টাকাতেই তাঁর কোনো মতে চলে।

কত বড় মেয়ে?—ললিতার দৃষ্টি জিজ্ঞাসু হয়ে উঠল। কেমন অস্বস্তি লাগল শৈলেনের।

একটি বি-এ পড়ে, আর দুটি স্কুলের ছাত্রী।

ও।

একটুকরো হালকা মেঘকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে শৈলেন বললে, সিঁড়ি আলাদা—কোনো সম্পর্ক নেই।

ললিতা বললে, তা বটে। তবু বাড়িওলার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা! কথায় কথায় খিটিমিটি বাধতে পারে। তা ছাড়া বাড়িউলী আরও ডেন্‌জারাস্! সব সময়েই নাক উঁচু করে থাকবে। বিধবার আবার ছত্রিশ রকমের ফ্যাসাদ—হয়তো একদিন মুরগীর পালক উড়তে দেখলে—

না-না, সে সব কিছু নেই। ভদ্রমহিলা বেশ কালচার্ড।

তা হলে আর বলবার কী আছে। যেমন চাওয়া গিয়েছিল—দালাল ভদ্রলোক ঠিক তেমনটিই জুটিয়ে দিয়েছেন। এর পরে

পরমোৎসাহে বাক্স প্যাটরা গুছিয়ে নিতে যা দেরি। তবু ললিতা কেমন গম্ভীর হয়ে রইল।

শৈলেন বললে, তা হলে আজই ভাড়াটা দিয়ে কণ্ট্রাক্ট্ করে আসি।

আজই ?

আরও অনেকে ঘুরছে তো। আজকের ভেতরে সেট্‌ল না করলে উনি অন্য কাউকে দিয়ে দেবেন। তা ছাড়া পয়লা তারিখে বাড়ি বদলাতে হলেও তো সাতদিনের বেশি সময় নেই।

সাতদিন ?—ললিতা চমকে উঠল : এর মধ্যে কী করে হবে ?

শৈলেন হাসল : কেন হবে না ? এত কি ফার্নিচার আছে আমাদের যে সরাতে তিনদিন লাগবে ? ও তো একটা লরীর মামলা—এক ঘণ্টার ব্যাপার।

আর চিঠিপত্র যা কিছু এ ঠিকানায় আসবে ?

পোস্ট্ আপিসে খবর দিয়ে রাখব। ওখান থেকেই রি-ডাইরেক্ট করে দেবে।

ললিতা আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তার পর আস্তে আস্তে বললে, বেশ, সেই ভালো।

শৈলেনেরও যে খুব ভালো লাগছিল তা নয়।

অনেকদিন হয়ে গেল এ-পাড়ায়, প্রায় বারো বছর। এই অন্ধ গলিতে এসে যখন ওরা ঢুকেছিল, তখন যুদ্ধ চলছে কলকাতায়। একতলায় একখানা এঁদো ঘর যোগাড় করতেও তখন হাজার টাকা সেলামী দিতে হত। সেই সময় এ বাড়ি যোগাড় করেছিল ললিতাই। তার এক সহপাঠিনী বান্ধবীর স্বামী খুঁজে দিয়েছিলেন।

পুরোনো দোতলা বাড়ি। দিনের বেলাতেও উঠোনটা পর্যন্ত অন্ধকার। সামনে একটা মুখ-খোলা কল, তা দিয়ে ছর্‌ছর্ করে একটানা জল পড়ছে। নিচের ঘরগুলোর শ্যাওলাধরা কালো কালো দেওয়ালগুলো দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়ায় বলে মনে হয়। পুলিস কোর্টের এক উকিল তার বাসিন্দা। ওকালতি করে ভদ্রলোক

বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি—পাড়ার মুদী সময়ে অসময়ে তাগাদা করে যায়—তার ভাষাটা কখনো কখনো খুব মোলায়েম বলে মনে হয় না। তবে লক্ষ্মীর কৃপা না থাকলেও ষষ্ঠী ঠাকরুণ অনুগ্রহ করেছেন—পাঁচ ছ'টা ছেলেপুলে। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা কি রকম হচ্ছে—সে কথা বলে লাভ নেই—কিন্তু পাড়ায় ফল বা খেলনা নিয়ে ফিরিওলা ঢুকলে কিছু না কিছু হাত-সাফাই তারা করেই। ধরাও পড়ে মধ্যে মধ্যে। তখন বাপ তাদের সকলকে পাইকিরি দরে প্রহার শুরু করেন। আর আধ মাইল দূর থেকেও সম্মিলিত আর্তনাদের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

তাদের হাড় বের করা নুয়ে পড়া মা কিন্তু নির্বিকার। ভাতের ফ্যান গালতে গালতে কোটরগত চোখ দুটো দিয়ে অগ্নিবৃষ্টি করেন সমস্ত ব্যাপারটার ওপর। দাঁতে দাঁত ঘষে হিংস্র গলায় বলেন, মরুক—মরুক—রাবণের গুষ্টি নিপাত যাক। শহরে এত প্লেগ হয়—এত কলেরার মড়ক লাগে—যম কি পোড়া চোখে এই শূয়োরের পালকে দেখতে পায় না?

এই বাড়ির দোতলাটা সংগ্রহ করেছিল ললিতা। আড়াইখানা ঘর—অর্থাৎ দুটো ঘর, একটুখানি তিনদিক ঢাকা বারান্দা—সেখানে রান্নার কাজ চলে। ভাড়া পঁচাত্তর টাকা। দোতলার সিঁড়ির পুরোনো কাঠের রেলিংটা নড়বড় করে—একটু অসতর্ক হলেই বিপর্যয় কাণ্ড ঘটবার সম্ভাবনা।

বাড়িতে ঢুকেই ললিতা নাকে কাপড় দিয়েছিল। পচা ইঁদুরের গন্ধ আসছিল কোত্থেকে। বিকৃত মুখে বলেছিল, ও মাগো—এ কোথায় এলাম!

আর শৈলেন দেখেছিল, একটা ছেঁড়া লুঙ্গি পরে বাজারের থলি হাতে এক মাঝবয়েসী ভদ্রলোক সমানে চ্যাঁচাচ্ছেন: একদিনে আধ পো আলু শেষ করে বসলে? রাক্ষস ঢুকেছে নাকি তোমাদের পেটে? এই হারামজাদার পাল কি কাঁচা আলু খেয়েই সাফ করে দিয়েছে নাকি?

মনে মনে শৈলেন বলেছিল, কী সর্বনাশ!

তিন-চার দিন গুম্ হয়ে থেকে ললিতা বলেছিল, এ বাড়িতে কেমন করে থাকা যায় বল তো?

যেমন করে নিচের ভদ্রলোক রয়েছেন।

উনি পারলেও আমরা পারব না।

না পেরে উপায় কী? যাওয়ার জায়গা কোথায়—বলো? এ বাড়ি যোগাড় করতেই প্রায় এক বছর সময় লাগল—সেটা খেয়াল আছে?

বাড়ির দরকার নেই। চলো—আমরা গড়ের মাঠে গিয়ে তাঁবু খাটিয়ে থাকি!

কথাটা বেশ রোম্যান্টিক, শুনতে মন্দ লাগে না। কিন্তু গভর্নমেণ্ট একটু বাধা দেবে। তা ছাড়া ওখানে এখন মিলিটারীর আড্ডা। এই টুকটুকে রাঙা বউ নিয়ে আমি—

থাক, থাক, আর বলতে হবে না।

সত্যি, বলে কোনো লাভ নেই। চেষ্টা-চরিত্র করলে বরং চাঁদে গিয়ে পৌঁছোনো চলে, কিন্তু বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না, ট্রেনে রিজার্ভেশনও নয়। সুতরাং এইখানেই থেকে যেতে হল। থেকে যেতে হল এই আড়াইখানা চুন-বালি খসা ঘরের অবরুদ্ধ আব-হাওয়ার ভেতরে, নিচের দারিদ্র্যজীর্ণ অপরিচ্ছন্ন জীবনের সঙ্গে মানিয়ে—বীভৎসতম স্নানের ঘরের বিভীষিকাকে সহ্য করতে করতে।

বাড়ি-বদলানোর কথা প্রায়ই উঠেছে। নিচের উঠোনে উকিল বাবুর ছেলেমেয়েদের আর্তনাদ শুনতে শুনতে—বর্ষার দিনে ছাত থেকে চুন-বালি খসে পড়ার আতঙ্কের মধ্যে—যখন মনে হয়েছে: এখনি বুঝি সবসুদ্ধ ধসে পড়বে মাথার ওপর। অথবা কখনো কখনো নিচের তলার ছেলেমেয়েরা এসে রেডিয়োর চাবি খুলে দিয়েছে, কিংবা একরাশ কাপ-ডিশ ভেঙে ফেলেছে, তখন ললিতা বলেছে, না—আর নয়।

শৈলেন বলেছে, ঠিক কথা। অসম্ভব।

আর এখানে থাকা যায় না।

থাকলে পাগল হয়ে যাব!

একটা বাড়ি দেখো। যেখানে হোক—যেমন হোক।

আমাদের অফিসের তারাপদ খবর দিয়েছিল গড়পারের ওদিকে দু'খানা ঘর খালি আছে। অফিস ছুটির পরে যাব সেখানে—অত্যন্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মনে হয়েছে শৈলেনকে।

তাই করো। দরকার হলে টাকা আগাম দিয়ে এসো।—ললিতা আরও বেশি উৎসাহিত হয়েছে।

কিন্তু অফিস থেকে বেরিয়েই হয়তো মত বদলেছে শৈলেনের। এই সারাদিন খাটুনির পরে এখন আবার গড়পারে দৌড়োনো। আজ থাক।

বাড়ি ফেরবার পরে চা দিতে দিতে ললিতা হয়তো অলস কৌতূহলে জানতে চেয়েছে: গিয়েছিলে গড়পারে?

যাব ভাবছিলাম। কিন্তু ভারী টায়ার্ড লাগল। যাব আর একদিন।

আচ্ছা, যেয়ো আর-একদিন।

ব্যাস্—এই পর্যন্তই। এমনি করেই কেটেছে মাসের পর মাস—বছরের পর বছর। কখনো তারাপদ, কখনো হরিপদ, কখনো রামপদ—অথবা অমনি যে-কেউ খবর এনে দিয়েছে বাড়ির। দু-একবার দেখাও হয়েছে—কিন্তু পছন্দ হয়ে ওঠে নি।

বড় বেশি ভাড়া চায় কিন্তু।

শৈলেন বলেছে, সে তো বটেই। দু'খানা ঘর আর একটা রান্নাঘর আশি টাকা! অসম্ভব।

নইলে:

ভাড়াটা কম বটে, কিন্তু ঘর দুটো দেখছ! কী অন্ধকার।

দিনের বেলাতেও আলো জ্বালতে হয়।

সেই এঁদো বাড়িতেই যদি থাকতে হয়—তা হলে এ আর দোষ করেছে কী!

কিছু না—কিছু না। বদলাতে হলে ভালো দেখেই বাড়ি খুঁজে নিতে হবে—বারে বারে ঠাঁইনাড়া করবার মেহনত কি পোষায়? বাড়ি বদল তো নয়—যেন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড!

তা হলে বারণ করে দিই?

দাও।

আর নতুবা:

বাড়ি তো মন্দ নয়—ভাড়াও সস্তাই—কিন্তু বাড়িওলা—

লোক বাপু ভালো বলে মনে হল না। কী ক্যাঁটকেঁটে কথা। আবার বায়নাক্কা কী—বাঙাল কিনা—ঝগড়াটে কিনা—বাড়িতে সময়-অসময়ে মানুষজন আসা যাওয়া করবে কিনা। অত দিয়ে তোমার কী দরকার—শুনি? ভাড়া দেব মাসের পয়লা তারিখে, থাকব নিজেদের মতো, তোমার সবতাতেই অত নাক গলানো কেন?

তা ছাড়া সাত বছর মামলা করে তবে আগের ভাড়াটেকে তুলেছে।

তবে তো সাংঘাতিক লোক। না বাপু, ও-সব ঝামেলায় আমাদের দরকার নেই। তুমি থাকো অফিস নিয়ে—আমাকে দৌড়োতে হয় স্কুলে। ও-সমস্ত মামলা-মোকর্দমার হাঙ্গামা কে পোয়াবে। ছেড়ে দাও—সুস্থ শরীরকে আর ব্যস্ত করতে হবে না।

আসল কথা, এই পুরোনো এঁদো বাড়িটা যেন অভ্যাস হয়ে গেছে দু'জনের। এ-যেন একটা বিশ্রী বিরক্তিকর নেশা—খারাপ লাগে, অথচ ছাড়বারও শক্তি নেই। বাড়ি বদলের কথা ভাবলে মনটা প্রথম দিকে বেশ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। কিন্তু একটু পরেই মনে হয়—থাক না, চলে তো যাচ্ছে এক রকম করে।

দু' জনের ছোট সংসার—নিজেদের মতো করে থাকা। রোজগার যা হয় তাতে জীবিকার প্রয়োজন মিটিয়েও সামান্য কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকে প্রায় প্রতি মাসেই। সেটা খরচ হয় পুজোর ছুটিতে

ভারতবর্ষের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে লম্বা পাড়ি জমিয়ে। মোটের ওপর আত্মতৃপ্ত আর আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাত্রা।

এই শামুকের খোলার মধ্যে বাস করে করে এখন আর চট করে নতুন কিছু করবার উৎসাহ আসে না। বাড়ি বদলেরও না। দৌড়োদৌড়ি করো—দরদাম করো—একে ধরো, তাকে ধরো। তার পরে কোথায় লরী—কোথায় কুলি। নতুন আস্তানায় গিয়ে আবার সব গুছিয়ে নেবার বিরক্তিকর ব্যাপার। সে সব মিটলে অন্যান্য ভাড়াটেদের সঙ্গে নতুন করে মিতালি পাতানো। সেটা সহজে সম্ভব হবে কিনা কে জানে—হয়তো এমন লোকের সঙ্গে বসবাস করতে হবে—যাদের সঙ্গে এক ঘণ্টা কাটানোও দুঃসাধ্য।

তাই আট বছর ধরে আর বাড়ি বদল করাই হয় না।

দক্ষিণ কলকাতার বন্ধুরা এলে প্রায়ই বলেন, এখানে কী করে থাকো হে। আমাদের যে ঢুকেই দমবন্ধ হয়ে যায়।

শৈলেন জবাব দেয়, উত্তর কলকাতায় এর চাইতেও খারাপ গলি আর খারাপ বাড়ি আছে ভাই। মানুষ সেখানেও থাকে—এবং বেঁচেও থাকে।

তা বটে—তা বটে। বাড়িটা কেমন আনহেল্‌দি—

ইমিউন্‌ড্‌ হয়ে গেছি। তোমাদের দক্ষিণই বরং আমাদের এখন সইবে না। অত মলয় পবন গায়ে লাগলে শেষ পর্যন্ত সর্দি জ্বর হয়ে বসবে।

তা যাই বলো, বাড়িটা বদলানো দরকার।

বেশ তো দাও না খুঁজে।

ব্রহ্মাস্ত্র। শৈলেন জানে, মুখে সদুপদেশ দেওয়া শক্ত নয়—কিন্তু উপযাচক হয়ে তাকে একটা বাড়ি খুঁজে দেবে এমন সদিচ্ছা বন্ধুদের কারো নেই—অতখানি সময়ও না।

ললিতার বান্ধবীরা অবশ্য টিপ্পনি কাটে অন্যদিক থেকে।

খুব টাকা জমাচ্ছিস—কী বলিস ভাই?

মানে ?

মানে আবার কী ? দু'জনে মিলে তো কম রোজগার করিসনে। কিন্তু এই এঁদো বাড়িতে পড়ে থেকে—অল্প ভাড়া দিয়ে—বেশ দু' পয়সা জমছে ব্যাঙ্কে।

যতটা সস্তা ভাবছিস তা নয়। ইলেকট্রিকের বিল নিয়ে প্রায় একশো টাকা পড়ে।

অ্যাঁ!

বান্ধবীদের চোখ প্রায় কপালে উঠছে : একশো টাকা—বলিস কী!

বিশ্বাস না করো—বাড়ি ভাড়ার রসিদ দেখাতে পারি।

এত টাকা দিয়ে এখানে পড়ে আছিস কেন ? চলে আয় না সাউথে—নিদেন পার্ক সার্কাসে। বেশ. খোলা হাওয়া পাবি—চারদিকে গ্রীন আছে—পার্ক আছে—

দে না একটা খুঁজে।

বান্ধবীরা একটু চুপ করে থাকে। শেষে একজন বলে, ইস ক'টা দিন আগে যদি বলতিস! আমার মামাই তো একটা ফ্ল্যাট্ ভাড়া দিলেন হিন্দুস্থান পার্কে। তেতালায় তিনটে ঘর—মাত্র আড়াইশো টাকা—

মাত্র আড়াইশো! ললিতা হাসে : শ দেড়েক টাকার সাহায্য তুই যদি মাসে মাসে করিস তা হলে বরং ও রকম একটা ফ্ল্যাটের কথা ভেবে দেখতে পারি।

যাঃ—ঠাট্টা করছিস। দু'জনে মিলে এত টাকা আনছিস—

পরের পাঁচটা টাকাও পাঁচশো টাকার মতো দেখায়—এমনি একটা অপ্রীতিকর কথা বলতে গিয়েও সামলে নিয়েছে ললিতা। বান্ধবীরা চা খেয়েছে—গল্প করেছে—তার পর বেরিয়ে যাওয়ার সময় আর একবার মনে করিয়ে দিয়ে গেছে : না ভাই, সত্যিই এবার একটা নতুন বাড়ি দ্যাখ। শৈলেনবাবুর তো অনেক জানাশুনো আছে—একটু চেষ্টা করলে উনি কি আর বাড়ি জোটাতে পারেন না ?

এত সব সত্ত্বেও এ বাড়িতে অনেকগুলো দিন কেটেছে। আট বছর। নিচের তলায় ওই পুলিস কোর্টের পসারহীন উকিলবাবু, তার কুরূপা স্ত্রী—শিক্ষা সংস্কৃতিহীন ছেলেমেয়ে, প্যাচপেচে নোংরা উঠোন, বীভৎসতম কলঘর—সব সয়ে যাচ্ছে একরকম। শামুকের খোলার মতো আত্মকেন্দ্রিক জীবন একরকম কেটে চলেছে।

তা ছাড়া দমদমায় একটুকরো ভালো জমির খবর পাওয়া গেছে—বেশ সস্তাও বটে। স্বামী স্ত্রী বছর খানেক থেকেই ভাবছে, জমিটুকু কিনে ওখানে একটা ছোটমতো আস্তানা করে নিলে মন্দ হয় না। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর ইন্‌সিয়োরেন্স থেকে ধার পাওয়া যাবে—ব্যাঙ্কেও হাজার দুই টাকা জমেছে। কল্পনাটা মনে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি বদলানোর উৎসাহও নিবে এসেছে। আর বার বার ঠাঁইনাড়া হয়ে কী হবে—একেবারে নিজেদের স্থায়ী ভিটেতে গিয়ে ওঠাই ভালো।

কিন্তু এর মধ্যে একটা বোমা ফাটল। আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল—যেমন করে হোক এবার বাড়ি বদলাতেই হবে—এখানে আর থাকা চলে না।

এক মুহূর্তের জন্যেও না।

ব্যাপারটা ঘটেছে রবিবার দিন।

এ-বাড়ির যে ছোট ছাতটুকু আছে—তা আইনত শৈলেনের আওতায়। কিন্তু তাই বলে ছাতের একচ্ছত্র মালিকানা কখনো দাবি করে নি শৈলেন। তাদের নিজেদের প্রয়োজন যৎসামান্য-দু' একখানা শাড়ি-কাপড় শুকোনো ছাড়া ছাতের সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্পর্কও নেই। একতলার গিন্নীই ওখানে তাঁর রাশি রাশি কাঁথা-কাপড় এনে জড়ো করেন—তাঁরই ছেলেপুলে ওখানে হুল্লোড় করে—ঘুড়ি ধরার চেষ্টা করে থাকে।

চেঁচামেচি হয় না তা নয়। মাঝে মাঝে বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে এলেও ললিতা সহ্য করে গেছে। কিন্তু সেদিন একটা অঘটন ঘটে গেল।

দুপুরবেলা অমানুষিক চিৎকার আরম্ভ হল ছাতে। একটু ঘুম এসেছিল, সেটুকু তো গেলই—সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরে গেল। ললিতা আর থাকতে পারল না।

এই—কেন অমন চেঁচামেচি জুড়েছিস দুপুরবেলায়?

আমরা খেলছি।

এ কিরকম খেলা? ভর দুপুরে একবারে ভূতের কীর্তন জুড়ে দিয়েছিস? নাম্—নেমে যা—! লেখা নেই, পড়া নেই—সারাটা দুপুর হাড় মাস একেবারে ভাজা ভাজা করে দিলে। নেমে যা বলছি—

কিন্তু বোমার পল্‌তেয় আগুন দিলে দশ-এগারো বছরের মেয়েটি। এ বয়েসেই যেমন মুখরা, তেমনি দুর্দান্ত। পটাং করে বলে ফেলল: ইঃ—উনি বললেই নেমে যাব! বাড়ির মালিক কিনা উনি? আমরাও তো ভাড়া দিয়ে থাকি!

ললিতার ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলে গেল।

তীব্রস্বরে ললিতা বললে, খুব কথা শিখেছিস তো? ভাড়া দিয়ে থাকিস! ভাড়া দিস একতলার—দোতালায় যে তোদের উঠতে দিই সে দয়া করে। নেমে যা বলছি এখুনি—নইলে চড়িয়ে গাল ভেঙে দেব!

ললিতার রুদ্রমূর্তি দেখে ছেলেমেয়েগুলো পালালো। কিন্তু তার পরেই রঙ্গমঞ্চে নামলেন উকিলবাবুর স্ত্রী।

ললিতাকে সোজাসুজি যে কিছু বললেন তা নয়। মেয়েটি নিশ্চয়ই তার মায়ের কাছে সমস্ত জিনিসটার একটু বিস্তৃত অলংকৃত বিবরণ দিয়ে থাকবে—একেবারে ক্ষেপে গেলেন ভদ্রমহিলা।

ছেলেমেয়েগুলোকে তিনি ডাইনে-বাঁয়ে ঠ্যাঙাতে লাগলেন। সারা বাড়ি জুড়ে দানবিক কান্নার যে কোরাস শুরু হল, তা শুনে মরা মানুষেরও লাফিয়ে ওঠবার কথা। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। শিশুপালের চিৎকার ছাপিয়ে ভদ্রমহিলার শব্দভেদী বাণ এসে ললিতাকে জর্জরিত করতে লাগল।

কেন যাস—কেন মরতে যাস ওখানে? বড়লোকের লাথি

ঝাঁটা না খেলে বুঝি পেট ভরে না? আর যদি কোনোদিন ছাতের দিকে এগোবি তা হলে আঁশবঁটি দিয়ে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব সব ক'টাকে। ওঃ—ভারী বড়লোক হয়েছেন। টাকার গরমে ধরাকে সরা দেখছেন একেবারে। ছেলেপুলে একটুখানি খেলা করেছে বলেই সোনার অঙ্গ ক্ষয়ে গেল! আর সইবেই বা কী করে? নিজে তো বাঁজা—একটাও পেটে ধরে নি—ছেলেপুলের মায়া বুঝবে কোত্থেকে?

এতক্ষণ সইছিল, শেষ কথাটায় একেবারে নীল হয়ে গেল ললিতা।

দশ বছর বিয়ে হয়েছে—কিন্তু এখনো মা হওয়ার সৌভাগ্য ঘটে নি ললিতার। দিনের পর দিন নিঃসন্তানা মায়ের যন্ত্রণা তাকে তিলে তিলে পুড়িয়েছে—মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি—খালি বুকের ভেতরটা তার জ্বলে জ্বলে খাক হয়ে গেছে। অনেকদিন রাতে তার চাপা কান্নার শব্দে জেগে উঠেছে শৈলেন: কী হয়েছে ললিতা?—ললিতা জবাব দেয় নি—শৈলেনের বুকের মধ্যে মাথা রেখে ফুঁপিয়েছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

ডাক্তার পরীক্ষা করেছিলেন।

মাথা নেড়ে বলেছেন, আই অ্যাম সরি মিস্টার দে। মিসেস দে কখনো মা হতে পারবেন না। প্রকৃতি ওঁকে বঞ্চিত করেছে। ইয়োরোপে নিয়ে গিয়ে একটা অপারেশন করিয়ে দেখতে পারেন—কিন্তু তাতেও যে কিছু হবে তা জোর করে বলা যায় না।

মিটে গেছে ওখানেই। ললিতা জীবনে কখনো মা হতে পারবে না।

যন্ত্রণা। বুকের ভিতরে অন্তঃশীলা যন্ত্রণা। আজকে সেই যন্ত্রণার ওপরে বিষ ঢেলে দিলেন উকিলবাবুর স্ত্রী। শৈলেন ইছাপুরে গিয়েছিল এক পরিচিত বন্ধুর পুকুরে মাছ ধরতে। সন্ধ্যাবেলায় যখন ফিরল, তখন ঘরে আলো জ্বলে নি। মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে চুপ করে শুয়ে আছে ললিতা।

লতা!

জবাব নেই!

সীমাহীন আতঙ্কে শৈলেন ললিতার গায়ে হাত রাখল। না—স্বাভাবিক নিশ্বাস পড়ছে, গায়েও কোনো উত্তাপ নেই। শুধু মেঝের অনেকখানি ভিজে গেছে, আর থেকে থেকে সারা শরীর ফুলে ফুলে উঠছে তার।

লতা—কী হল?

অবরুদ্ধ গলায় ললিতা বললে, কালই এ বাড়ি ছাড়ো—নইলে আমি সুইসাইড করব।

বাড়ি অবশ্য পরদিনই যোগাড় হয় নি। অফিসে গিয়ে দু-একজনকে বলতে একজন বিচক্ষণ দালালের ঠিকানা পাওয়া গেছে। আর সেই দালাল ভদ্রলোক তিন চারদিনের মধ্যেই এই বাড়ির সন্ধান এনে দিয়েছেন। তাঁর দাবি বেশি নয়—শুধু একমাসের ভাড়াটা তাঁকে কমিশন দিতে হবে।

বাড়ি দেখে শৈলেন মুগ্ধ।

বাঃ—একেই বলে বাড়ি। তেতলায় তিনখানি, ঘর—একেবারে নতুন। তিনদিকে রাস্তা। খোলা জানালা দিয়ে হুহু করে হাওয়া আসছে। বড় রাস্তার কাছেই—অথচ বাস-ট্রামের ঘড়ঘড়ানিতে কান ঝালাপালা হয়ে যায় না। রাস্তা পেরলেই মার্কেট—পাঁচ মিনিটেই বাজার করে আসা যায়।

দালাল বললেন, এ বাড়ির জন্যে কত লোক যে আসা-যাওয়া করছে তার ঠিক নেই। তবে আপনাদেরই ওঁদের পছন্দ। নির্ঝঞ্ঝাট সংসার আপনাদের—ওঁরাও চান—

অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে ফিরেছে শৈলেন।

হ্যাঁ—এতদিনে একটা বাড়ি দেখলাম বটে লতা। দেখে মনে হল—সত্যি, এ আমরা কোথায় পড়ে আছি! একি ভদ্রলোকের থাকবার জায়গা। আর ওখানে নতুন ঘর—চারদিকে ঝক্‌ঝক্‌ করছে আলো—গ্রীষ্মকালেও পাখা খুলতে হবে না—এমনি প্রাণজুড়োনো হাওয়া।

তবে বাড়িউলি।

না—ভদ্রমহিলা শিক্ষিতা। খুব চমৎকার ব্যবহার।

বাড়িতে বড় বড় মেয়ে—

স্ত্রী মাত্রেরই এ একটা সংশয়ের জায়গা। শৈলেন আশ্বাস দিয়ে বলেছে : ওদের আর-একটা আলাদা সিঁড়ি আছে।

ললিতা চুপ করে থেকে বলেছে : আচ্ছা যা হয় ঠিক করো।

আজকালের মধ্যেই আগামটা দিয়ে আসতে হবে কিন্তু। নইলে ওঁরা অন্য কারুর সঙ্গে ঠিক করে ফেলবেন—অনেকেই বাড়িটার জন্যে ঘোরাঘুরি করছে। টাকাটা দিয়েই আসব তবে।

বেশ তো।

ললিতা চুপ করে বসে ছিল। এই বদ্ধ বাড়িতে জানালা দিয়ে যতটুকু আকাশ দেখা যায় তার দিকে তাকিয়ে।

এখান থেকে চলে যেতে হবে। আট বছরের মায়া কাটাতে হবে। মনটা খচখচ করছে।

কিন্তু কিসের মায়া—কিসেরই বা বন্ধন? কী সম্পর্ক এই বাড়ির সঙ্গে? এও তো ভাড়াটে বাড়ি। একে মানুষের বাসের অযোগ্য তার ওপরে গলাকাটা ভাড়া। কোন দুঃখে এখানে পড়ে থাকা—কিসের আকর্ষণে?

সব চেয়ে বড় কথা নিচের উকিলবাবুর স্ত্রী। কী অশ্লীল—কী কুৎসিত—কী অশিক্ষিত! বিন্দুমাত্র শিক্ষা-দীক্ষা থাকলে এমন কদর্য ভাষায় তাকে কি এভাবে কটু আক্রমণ করতে পারত?

কখনো কখনো উপকার একেবারে যে করে নি তা নয়। একবার জ্বরে পড়েছিল—মহিলা এসে সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। বাড়ির চাকর পালিয়ে গেলে নিজের পনেরো বছরের ছেলেটাকে দিয়ে বাজারও করিয়ে দিয়েছেন। মধ্যে মধ্যে পানের বাটা হাতে নিয়ে উঠে এসেছেন ওপরে, গল্প করেছেন বসে বসে, বলেছেন, দিদি আপনাদেরই জীবন সার্থক। কত লেখাপড়া শিখেছেন—কত জানেন! আমাদের কেবল জোয়াল টেনেই গেল।

কিন্তু ওগুলো কেবল বাইরের মুখোস মাত্র। একটুখানি হাওয়াতেই সে মুখোস উড়ে গেছে—বেরিয়ে এসেছে বীভৎস কদর্য রূপটা। এতদিনে ললিতা বুঝেছে—কী ভয়ানক নরকের মধ্যে তাকে বাস করতে হচ্ছিল।

না—এ বাড়ি ছাড়তেই হবে। এখানে আর বাস করা চলে না।

সামনের বাড়ির জানালা খুলল। মুখ বের করলে একটি তরুণী বধূ।

শুনলাম, আপনারা নাকি পাড়া ছেড়ে যাচ্ছেন ভাই ?

খবরটা ছড়িয়েছে এর মধ্যেই। দালালের আসা-যাওয়া দেখেছে সবাই—শুনেছে গলিতে দাঁড়িয়ে শৈলেনের সঙ্গে আলোচনা। কথাটা কারোই বোধহয় জানতে আর বাকী নেই এখন।

চেষ্টা করছি তো।

বাড়ি ঠিক করলেন কোথায় ?

এণ্টালীতে।

তা ভালোই। বাজারের এপারে না ওপারে ?

ওপারেই শুনেছি।

তা হলে মন্দ নয়। বাজারের এদিকটা নোংরা—ওধারটা বেশ ঝকঝকে। আমার মামাও ওদিকেই থাকেন কিনা। কোন্ রাস্তায় ভাই ?

উনি জানেন। আমার মনে নেই।

বধূটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তা যান। সুবিধে মতো বাড়ি পেলে এখানে আর পড়ে থাকবেন কেন ? তা ছাড়া নেহাত আপনারা বলেই এত ভাড়া দিয়ে এতদিন পড়ে ছিলেন এখানে—আর কেউ হলে রেণ্ট্ কণ্ট্রোলে নালিশ করে মজা টের পাইয়ে দিতেন বাড়িওলাকে। যাচ্ছেন যান—পাড়াটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে।

শুধু পাড়াই ফাঁকা হয়ে যাবে না—ললিতার মনটাও ফাঁকা

হয়ে যেতে চাইছে এর মধ্যেই। এই পুরোনো এঁদো বাড়ি—অসম্ভব রকমের বেশি যার ভাড়া—সেখানে থাকবার সপক্ষে কোনো যুক্তিই কোথাও নেই। তবু যেন কোথায় নাড়ীতে টান পড়ছে—কী যেন একটা মায়ার বাঁধন জড়িয়ে ধরছে চারদিকে।

জানলাটা বন্ধ করে চলে যেতে যেতে ও-বাড়ির বধূটি বললে, সত্যি—ভারী খারাপ লাগছে। কবে যাবেন ?

আসছে মাসেই।

আমাদের ভুলে যাবেন না ?

আমি ভুলব কেন ? বরং আপনারাই ভুলে যাবেন। যারা দূরে চলে যায়—তাদের কি কেউ আর মনে রাখে ?

ছি ছি, বলবেন না ওকথা।

বৌটি চলে গেল।

ঘরে চলে এল ললিতা। বাড়ি বদলাতে হবে। কিন্তু ঝামেলা কি সত্যিই কম! শৈলেন অবশ্য বলেছে, এমন কি আর জিনিসপত্র আমাদের আছে যে সেগুলো সরাতে তিন দিন লাগবে! তিন দিন লাগবার মতো কিছু হয়তো নেই—কিন্তু যা জড়ো হয়েছে—তার পরিমাণই কি কম! খাট, চারটে চেয়ার, ড্রেসিং টেব্‌ল, দুটো আল্‌মারী, সেলাইয়ের কল, একটা ছোট সিন্দুক, রেডিয়ো, শ' দেড়েক বই, গোটা পাঁচ-সাত ট্রাঙ্ক-স্যুটকেশ, বাসনপত্র। এগুলোকে সরানো—গলি থেকে সাবধানে বের করা, নতুন বাড়ির তেতলায় নিয়ে ওঠানো। তাতে যে কী থাকবে, কী ভাঙবে জোর করে বলা শক্ত। তার পরে সেগুলোকে আবার সাজানো-গোছানো! ঝামেলা কি চারটিখানি! উঃ—ভাবতেই যেন গায়ে জ্বর আসতে চায়। আট বছর আত্মতৃপ্ত জীবন কাটিয়ে এখন আর এসব বিড়ম্বনা বরদাস্ত হয় না।

কিন্তু যেতেই হবে। এখানে আর থাকা চলে না।

ললিতা একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলল। স্যাঁৎসেঁতে দেওয়াল। মাথার ওপরে কড়ি-বরগার পাশ থেকে মাঝে মাঝে বালি চুন

খসে গিয়ে লাল সুরকি বীভৎস হাসির মতো বেরিয়ে রয়েছে। এক-আধদিন মুষলধারে বৃষ্টি নামলে দু'চার ফোঁটা জল চুইয়েও পড়ে ছাদ দিয়ে—ভয় হয়, কখন সব কিছু খসে পড়বে। তবু—তবু এই ঘরটা বড় বেশি চেনা হয়ে গেছে—এর প্রত্যেকটি ইঞ্চির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে একটা অদ্ভুত অভ্যাস—একটা নিবিড় মমতা।—

তবু এসব কাটাতেই হবে। নিচের ভদ্রমহিলার সঙ্গে আর বাস করা চলে না। ওঁর মুখের দিকে ললিতা এর পরে আর চোখ তুলেও চাইতে পারবে না কোনোদিন।

দিদি!

বিদ্যুৎচমকের মতো ললিতা চমকে উঠল।

দিদি!

ললিতা স্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। উকিলবাবুর স্ত্রী এসে ঘরে ঢুকেছেন।

কী একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল যেন। ভদ্রমহিলা প্রায় ছুটে এসে ললিতার পা জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর সারা মুখ চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে।

ছিঃ—ছিঃ—এ কী করছেন!

আমায় ক্ষমা করুন দিদি। আপনার মনে কষ্ট দিয়েছি—যা নয় তাই বলেছি, সেজন্যেই বুঝি ভগবান আমায় শাস্তি দিচ্ছেন! কাল থেকে আমার মেয়েটা জ্বরে বেহুঁস হয়ে রয়েছে—একফোঁটা জল পর্যন্ত গলছে না গলা দিয়ে। আমায় ক্ষমা করুন—আপনার শাপেই—

কী বলছেন আপনি? শাপ দেব কেন? ছিঃ—উঠুন, উঠুন—

না, বলুন আমায় মাপ করেছেন—আমার মেয়েকে আশীর্বাদ করেছেন। নইলে এখানে আপনার পায়ে আমি মাথা খুঁড়ে মরব!

ভদ্রমহিলা সত্যিই মাথা খুঁড়তে লাগলেন মেজেতে।

দু' হাত বাড়িয়ে ললিতা তাঁকে টেনে তুলল। সান্ত্বনা দিয়ে বললে, একটু শান্ত হোন দিদি। কেন মিথ্যে দুশ্চিন্তা করছেন? ছেলেপুলের অমন অসুখ করেই, আবার দু' দিন বাদে সেরেও যায়। চলুন, আমি দেখছি—

ঠিক সেই সময়ে দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ালো শৈলেন।

লম্বা বাড়ি ভাড়ার আগাম টাকাটা—

বলতে গিয়েই থেমে গেল শৈলেন—এক মুহূর্তে ঘরের দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছে সে, একটা নতুন তাৎপর্য ধরা পড়েছে তার কাছে। যে ফাটলটা তৈরি হয়েছিল—সেটা নিঃশেষে জুড়ে গেছে আপাতত।

এর পরে আর ললিতার কাছে নতুন বাড়ির জন্যে টাকা চাওয়া যায় না। বোধ হয় চাইতেও হবে না আপাতত।

আস্তে আস্তে দরজার পাশ থেকে সরে গেল শৈলেন। যেন ওরা তাকে দেখতে না পায়। এই দুর্বল মুহূর্তে ওদের দু'জনকে সে আর লজ্জা দিতে চায় না।

শেষ পর্যন্ত খুঁজতে খুঁজতে বেণু যে এই দোকানে এসেও পৌঁছুবে মীরা এতখানি আশা করতে পারে নি। প্রগল্‌ভ সন্ধ্যা ধারালো হয়ে আছে চারদিকে। একটু দূরেই মস্ত সিনেমা-হাউসটার সামনে রাশি রাশি মোটরের প্রতীক্ষা। বিরাট রঙীন পোস্টারে স্প্যানিশ কারমেনের উন্মত্ত নাচের ভঙ্গি। সামনের হোটেলের গায়ে নীলাভ নিয়নের নির্লজ্জ আত্মঘোষণা : লেট্‌স গো টু—

হাওয়াই শার্ট, সেলর শার্ট, নানা রকমের ট্রাউজার, কম্বিনেশন শু। সালোয়ার, ভয়েলের শাড়ি, প্যারীর সন্ধ্যার সুগন্ধি। ইয়াঙ্কী সিগারেটের চকোলেট ফ্লেভার। দু'জন বিদেশী নাবিকের সঙ্গে রাস্তার ওপরেই ভাব জমাতে চাইছে সস্তা রেয়নের স্কার্ট-পরা শীর্ণদেহ একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে। ময়রা শিয়ারারের নাচের অর্কেস্ট্রার ঘূর্ণি ঘুরছে হাওয়ায়।

এইখানে বেণু! শুধু বেমানান নয়—দস্তুরমতো অবাঞ্ছিত।

প্রথমটায় অত লক্ষ্য করে নি মীরা। কাউণ্টারের টেবিলে ঝুঁকে পড়ে ক্যাশমেমো কাটছিল একজন পার্শী ভদ্রলোকের জন্যে। আবছা চোখ তুলে অভ্যাসের হাসি ফুটিয়েছিল ঠোঁটের কোনায়, মিষ্টি গলায় বলেছিল, ওয়ান মিনিট প্লীজ।

বেয়ারা প্যাকিংগুলো বাইরের গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবার পরে, চোখ তুলে তাকাবার ফুরসুত পেল মীরা : ওয়েল ম্যাডাম, হোয়াট্ ক্যান্ আই ডু ফর্ ইউ ?

কিন্তু ম্যাডাম নয়—বেণু! একপাশে স্তূপাকার রকিং হর্স-গুলো দেখছিল এক মনে। এইবার ফিরে দাঁড়ালো।

আরে, তুই ?

খাঁটি অন্তরঙ্গ বাংলায় মীরার বিস্ময় চল্‌কে পড়ল।

বাস্তবিক। বেণুকে ম্যাডাম বলবার মতো কোনো কারণ কোথাও

নেই। আঁচল জড়িয়ে পরা সাধারণ ডুরে শাড়ি—পায়ে শক্ত চামড়ার বিবর্ণ কাবলী চটি। গায়ে ময়লা ছিটের ব্লাউজ, কাঁধের ঝোলাটা আয়তনে প্রায় বেণুরই সমান। না, ও ভাষায় ওকে অভ্যর্থনা করা যায় না।

স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল ঝকঝকে হাসি হাসল বেণু: অনেকদিন পরে তোর খবর নিতে এলাম।

অনেকদিন—সন্দেহ কী। কলেজ ছাড়বার পরে সেই চার বছর আগে মাত্র একবার দেখা হয়েছিল রাস্তায়। কেমন আছিস্, কোথায় আছিস্—শুরু করতে না করতেই টুক করে সামনের ট্রামটায় উঠে পড়েছিল বেণু। বলেছিল, আজকে সময় নেই ভাই, অফিস আছে। আর-একদিন কথা হবে।

আজ সেই আর একদিন। চু' বছর পরে? আড়াই বছর?

প্রায় নিরর্থক সঙ্কোচেই শাড়ির আঁচলটাকে ভালো করে গুছিয়ে নিলে মীরা। বললে, বোস—বোস।

কিন্তু অনুরোধ করবার দরকার ছিল না—অন্তত বেণুকে তো নয়ই। ঘড়ঘড় করে একটা লোহার চেয়ারকে টেনে এনে ধপ করে বসে পড়ল। বেয়ারাটা পর্যন্ত চমকে উঠল এমনি অসঙ্গত ব্যবহারে।

বেণু বললে, বেশ জায়গায় চাকরি নিয়েছিস। খেলনার দোকানে।

চাকরি সব জায়গাতেই সমান—মীরা সপ্রতিভ হতে চেষ্টা করল: খেলনার দোকানেই হোক আর জাহাজ কোম্পানির অফিসেই হোক।

বেণু প্রতিবাদ করল না: তা বটে। তবু আবহাওয়ার খানিকটা তফাত আছে তো। গাদা গাদা ফাইলের চাইতে রং-বেরঙের খেলনা ঢের ভালো—চোখ চুটো জুড়িয়ে যায় অন্তত।

জুড়িয়ে যায় না—জ্বালা করে। কখনো কখনো পাগলের মতো ভাঙচুর করতে ইচ্ছে হয় সমস্ত। সেলুলয়েড্ আর প্লাস্-

টিকের পুতুলগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে ইচ্ছে হয়—ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হয় মেকানিক সেটগুলোকে—ম্যাজিক কলারের বইগুলোকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলার আকাঙ্ক্ষা জাগে, আর অদ্ভুত কল্পনায় মনে হয় পাশাপাশি সাজানো ওই 'কর্ক-গান'গুলো যদি 'শট গান' হত—

কিন্তু সে ক্লান্তি, সে অবসাদের কথা বলা যাবে না বেণুকে। বড় বেশি স্বাস্থ্যের হাসি বেণুর পরিষ্কার দাঁতগুলোতে, বড় বেশি ভালো-লাগার আনন্দ ওর দু'চোখে ঝলমল করছে। আপাতত ওর সেই ভালো-লাগা খানিকটা ধার করে নিতে হবে মীরাকে কিছুক্ষণের জন্যেও।

কথাগুলোকে তত্ত্বের দিক থেকে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে ঘুরিয়ে আনতে চাইল মীরা।

তুই এখনো সেইখানেই চাকরি করছিস বোধ হয়?

কোথায়? সেই রিহ্যাবিলিটেশনে? না—না, সে অনেক-দিন গেছে।

ছেড়ে দিয়েছিস?

এ বাজারে ইচ্ছে করে কেউ চাকরি ছাড়ে?—বেণুর হাসিটা এবার একটু ফিকে মনে হল: তা ছাড়া অমন ভালো মাইনের? ছাড়িয়ে দিয়েছে।

কেন?—প্রশ্নটা করেই মীরার মনে হল জিজ্ঞাসা করার কোনো দরকার ছিল না। চাকরি কেন যায় এ নিয়ে চিন্তা করবার অর্থই নেই আজকাল; কেন থাকে সেইটেই গবেষণা করবার মতো। এই চার বছরে মীরাকেও তিনবার চাকরি বদলাতে হয়েছে।

বেণু অবশ্য উত্তর দিলে একটা।

ওভারস্টাফ্‌ড্‌। আর—আর রাজনীতি।

শেষ শব্দটায় মীরা একবার চমকে উঠল। বেণু কি আজও কলেজের অভ্যাস ছাড়তে পারে নি, আজও কি রাজনীতি করে? সামনের দেওয়ালে নগ্ন নির্লজ্জ নিয়নটার ঝাঁঝ যেন মীরার চোখে

এসে লাগল, কুঁচকে এল চোখের পাতা। মনে পড়ল, এই দোকানের মালিক মিস্টার পালিয়া রাজনীতির কাঁকড়া-বিছের ভয়ে সন্ত্রস্ত আছেন সব সময়ে।

ও।—একটা নিরুত্তাপ একাক্ষর উচ্চারণ করল মীরা। ভয়েলের অবাধ্য শাড়িটা আবার পিছনে পড়তে চাইল কাঁধ থেকে। একবার বলতে ইচ্ছে হল: তুই আজ আয় বেণু—বড় ব্যস্ত আছি এখন।—কিন্তু বলবার আগেই নতুন খরিদ্দারের ভারী জুতোর আওয়াজ এল দোরগোড়ায়। একটা ফোঁড়া কেটে গেল যেন।

ওয়েল স্থার—হোয়াট ক্যান্ আই ডু ফর ইউ?

সেই স্বর—সেই সুর। যে গলায় বেণুকে সম্ভাষণ করেছিল, অবিকল সেই রকম। আশ্চর্য আয়ত্ত করেছে মীরা—বার বার একই প্রয়োজনে গ্রামোফোন রেকর্ড বাজানোর মতো নির্ভুল পুনরাবৃত্তি! শুধু স্থর আর ম্যাডামের তফাতটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই।

বেণুর কাছ থেকে দু-হাত দূরে কাউন্টারের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে লোকটা। মাঝবয়েসী লোক—মাথার অর্ধেকটা জুড়ে চকচকে টাক। তবু ভাঁজ করা ঘাড়টা সযত্নে ছাঁটা—পাউডারের পুরু প্রলেপ সেখানে। শার্টের কলারের নিচে একটা লাল রুমাল জড়ানো। পাউডার, ঘাম—আর, আর স্পিরিটের মতো কিসের একটা গন্ধ পাখার হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে ঘরময়। মদ খেয়ে এসেছে লোকটা।

একবার তাকিয়েই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল বেণু—চোখ মেলে রাখল সামনের একটা শেল্ফের দিকে। পর পর দুটো তাকে একদল রবারের খেলনা—মিকি-মাউস্—ডোনাল্ড্ ডাক্। অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে তাকিয়ে আছে তারা—ভ্যাংচাচ্ছে যেন।

রাস্তায় ব্যাঞ্জোর সুর—সেই লম্বা রোগা অন্ধ লোকটা চলেছে। দুটি লাল টক্টকে খাস বিলিতী সাহেবের পেছনে চলেছে কালো কালো ভিখারী ছেলের পাল। একটা লোক বিক্রি করতে চাইছে

বেলফুলের মালা। চৌরঙ্গীতে বেলফুল। বেণুর মতোই অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

বাইরের নাচের রেকর্ডের মতোই মীরার গলাও বেজে চলেছে একটানা। টুকরো টুকরো শুনতে পাচ্ছে বেণু।

মেকানিক্ সেট্—ছেলেদের ইন্‌টেলিজেন্স্ বাড়ে—

নো-নো—ও নয়—মদ-খাওয়া গলার ভরাট আওয়াজ। ঠিক ব্লাড হাউণ্ডের আওয়াজের মতো: নতুন কিছু চাই—বন্ধুর ছেলের জন্মদিন—

এই ক্যাট্ অ্যাণ্ড দি বল দেখুন। স্প্রীঙ্ দিলেই বল নিয়ে ডিগবাজী খেয়ে খেলা করবে বেড়াল। খাঁটি জাপানী ডল। কাস্টম্‌স বাঁচিয়ে আনা। কলকাতায় শুধু আমাদের দোকানেই পাওয়া যায়। ভেরি চীপ—মাত্র কুড়ি টাকা—

খুব সস্তা—মাত্র কুড়ি টাকা বেণু ঢোক গিলল। একটা দু-পয়সার খেলার পুতুল ক'জনে আজ কিনে দিতে পারে বাচ্চাদের? কিন্তু শেয়ালদার রথের মেলার কলকাতা এ নয়। এ আলাদা। সামনে জ্বলন্ত নিয়ন: লেটস গো টু—! এক রাত্রে কত খরচ হয় ওগুলো জ্বালতে? রাস্তায় এখনো বেলফুল বেচছে লোকটা। বৃষ্টি থেমে যাওয়া শান্ত অন্ধকারে, নারকেল পাতা থেকে টুপ্ টুপ্ করে টিনের চালায় জল পড়বার শব্দের সঙ্গে একাকার হয়ে যায় ভিজে মাটি আর বেলফুলের গন্ধ। সেই বেলফুলের কত দাম এখানে? পাঁচ টাকা? দশ টাকা? কে জানে।

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল—চমক লাগল হঠাৎ। তীক্ষ্ণ-তীব্র ভঙ্গিতে হাসছে মীরা—প্রতিদিনের অভ্যাসে অভ্যাসে শানানো হাসি। মদ-খাওয়া মোটা গলায় তখনো জড়িয়ে জড়িয়ে [illegible] জের টানছে লোকটা। কিন্তু একবার তাকিয়েই আবার মিকি-মাউস্‌গুলোর দিকে চোখ ফিরিয়ে নিতে হল বেণুকে। দু'চোখে লোকটার আদিম ক্ষুধার নগ্ন অনুসন্ধিৎসা—মীরার গা থেকে কখন পিছলে পড়ে গেছে পাতলা ভয়েলের শাড়িটা।

মিকি-মাউসের বিকসিত হাসিতে যেন মর্মান্তিক কৌতুক। মীরার জন্যে কোমল সহানুভূতিতে ভরে উঠল বেণুর মন। চাকরিই বটে! কী ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হয় তার জন্যে!

নোটের খচ্‌খচ্‌ আওয়াজ—ক্যাশমেমো লেখার শব্দ—কয়েকটা চেঞ্জের ঝনৎকার। আবার এক টুকরো জড়ানো রসিকতা—শান দেওয়া হাসির একটা তীক্ষ্ণ ঝিলিক, মিষ্টি সুরে 'থ্যাঙ্ক ইউ'—তার পর একটা প্যাকেট বগলে করে আবার বেণুর পাশ দিয়ে খচ্‌মচিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। ফ্যানের হাওয়ায় আর-একবার পাক খেলো ঘাম, পাউডার আর স্পিরিটের সেই মিশ্র গন্ধটা।

বেণু!—স্তিমিত শীর্ণ ডাক শোনা গেল মীরার।

বেণু মুখ ফেরালো: বল?

এইবার তোর খবর শুনি। কী করছিস?

একটা আশ্রম করেছি রিফিউজী মেয়েদের নিয়ে।—বেণু সহজ হতে চাইল: কাজ কিছু তো নিয়ে থাকতে হবে। তা ছাড়া নিজের সংসারও রয়েছে—

থাম্—থাম্—ভূত দেখার মতো চমকে উঠল মীরা: নিজের সংসার? বিয়ে করেছিস?

হাঁ, করলাম একটা—বেণুর শ্যামবর্ণ স্বাস্থ্যস্নিগ্ধ মুখে ভারী উজ্জ্বল দেখাল হাসিটা।

কাকে রে?—অদ্ভুত উত্তেজনায় সারসের মতো গলাটা বাড়িয়ে দিল মীরা—চোখের ওপর সেলোফোন কাগজের মতো কী চকচক করে উঠল: কে সে?

চাঞ্চল্যকর কেউ নয় ভাই। নিতান্তই পাড়াগাঁয়ের স্কুল মাস্টার!—বেণুর মুখে হাসিটা তেমনি জ্বলজ্বল করতে লাগল: তার ওপর দু'বার জেল ফেরত।

তবু সান্ত্বনা পাচ্ছে না মীরা—কেমন তেতো লাগছে গলার ভেতর। প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে, মৃত্যুদণ্ড শোনবার মতো চাপা স্বরে জানতে চাইল: আর—আর বাচ্চা?

আছে একটা ছেলে বছর দুয়েকের। ভারী দুরন্ত—বেণুর শ্যামবর্ণ মুখে লজ্জার ঢেউ দুলে গেল, ভারী মেয়েলী লাগল একদা স্পোর্টস্‌ম্যান বেণুকে।

টেবিল থেকে টুপ করে একটা পেনসিল পড়ে গেল নিচে। সেটাকে খুঁজতে কাউণ্টারের ওপারে ডুবে গেল মীরা—আবার বেণুর মুখোমুখি উঠে দাঁড়াতে প্রায় মিনিট দুই সময় লাগল।

বেশ আছিস তা হলে। একেবারে গিন্নী! ভারী খুশি হলাম—কাউণ্টার থেকে সরে গেল মীরা, একটা বল নিয়ে এল তাক থেকে: এইটে নিয়ে যা—তোর বাচ্চাকে দিস।

থাক।

থাকবে কেন?—রং-করা ভ্রূতে অভিমানের রেখা বাঁকিয়ে তুলল মীরা: আমি দিচ্ছি তোর খোকাকে।

সে হয় না ভাই—কিছু মনে করিসনে—একটা বিষণ্ণ নিশ্বাস ফেলল বেণু।

মাসী হিসেবে এটুকু দেবার জোর অন্তত আমার আছে, মীরা বলতে চাইল। হয়তো এরকম বলতে হয় বলেই ক্ষোভের রেশ টানল গলায়।

তুই ভুল বুঝছিস আমাকে—বেণুর স্বরে আবেগের ছোঁয়া লাগল: শুধু আমার বাচ্চা তো নয়—আরও পনেরো-বিশটি আছে ওখানে। নিতে হলে সকলের জন্যেই নিতে হয়। আমরাও ওই আশ্রমেই থাকি কি না।

ও।

আবার চুপচাপ। বাইরে নাচের রেকর্ড বেজে চলেছে সমানে। দপ্‌দপ করছে নিয়ন। চৌরঙ্গীর সান্ধ্য-মদিরতা ঘন হয়ে আসছে।

আধ বুড়ী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে ঢুকল একটি।

এত দেরি করলে মিস্ পার্কার? তোমার জন্যে একটু চা খেতে পর্যন্ত যেতে পারছি না, মীরার অনুযোগ শোনা গেল।

দুঃখিত। এবার যেতে পারো। তোমার ছুটি।—মিস্ পার্কার মীরার পাশে এসে দাঁড়ালো।

মীরা কুড়িয়ে নিলে ব্যাগটা। পাইথনের চামড়ার নকল ব্যাগ। পিছলে-পড়া শাড়িটাকে গুছিয়ে নিলে আর-একবার। বললে, চল বেণু, বেরুনো যাক।

বেণু বেরুতেই চাইছিল হয়তো। রং-বেরঙের খেলনাগুলো তার চোখে যেন খোঁচা দিচ্ছিল বার বার। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ল, মীরা কাউণ্টার থেকে ঘুরে বেরিয়ে আসবার আগেই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো।

চোখের একটা ইঙ্গিত করল মিস্ পার্কার।

কে ও মেয়েটি?

আমার বন্ধু।

পিয়োর ইনোসেন্স্।—একটা তির্যক হাসি ফুটল মিস পার্কারের ঠোঁটে: স্পয়েলিং হার টু?

বাজে বোকো না, চাপা ধমক দিয়ে বেরিয়ে গেল মীরা।

দু' পা এগিয়েই রেস্তোরাঁ এবং বার। মীরা বললে, চল চা খাই।

ওর ভেতরে?—বেণু কুঁকড়ে গেল। মিছিল-করা দুঃসাহসী মেয়েটা কেমন ঘাবড়ে গেছে এখানে—চাপা জয়ের উল্লাস যেন অনুভব করলে মীরা।

ভয় পাচ্ছিস?—

ভয় ঠিক নয়, তবে—বেণু একবার দ্বিধা করল: তবে অভ্যেস নেই কিনা।

চা খেতে অভ্যাস-অনভ্যাসের প্রশ্ন ওঠে না নিশ্চয়। চল—

কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল দু'জন। একবার বিহ্বল দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখল বেণু। পা দুটো জড়িয়ে আসতে চাইছে। এপাশে-ওপাশের টেবিলে দিশি-বিলিতী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পুরুষ-মেয়ে যারা বসেছে প্রত্যেকের সামনেই রঙীন গ্লাস। সেই

স্পিরিটের গন্ধের সঙ্গে চুরুটের ধোঁয়ার উগ্রতা মিশে দমচাপা আবহাওয়া একটা।

কী বেমানান এখানে বেণু—কী অদ্ভুত অসঙ্গত। যে বেয়ারাটা টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছিল, তারও চোখে সেই বিস্ময়ের আভাস।

মাথা নিচু করে বসেছিল বেণু,—সেই ফাঁকে বেয়ারাটার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল মীরার। না—না, ওসব নয়। গলা তুলে, বেণুকে শুনিয়ে শুনিয়েই যেন বললে, দু' পেয়ালা চা, চিংড়ির কাটলেট্।

বেণু মাথা তুলল : কাটলেট কেন ? চা-ই তো যথেষ্ট।

শুধু চা খাবি ? এতদিন পরে এলি।

কথা বাড়াতে চাইল না বলেই শুকনো মুখে বসে রইল বেণু। অপরিচিত অনভ্যস্ত আর-একটা কলকাতা। মীরার দোকানেই নয়, চারদিকেই এখানে খেলনার মিছিল। রঙীন—ঝকঝকে। নানা রঙের গেলাস সামনে নিয়ে দূরে আর কাছের টেবিলগুলোতে যারা বসে আছে তারাও। এমনকি, মীরাও বুঝি একটা পুতুল ছাড়া কিছু নয়! বাস্তবিক বেণু এখানে বেমানান—বড় বেশি বেমানান।

কী ভাবছিস ? —মীরার প্রশ্ন।

বেণু হাসল।

ভাবছিলাম ও আবহাওয়া সহ্য করিস্ কী করে ? ভালো লাগে ?

সব জিনিস কি আপনা থেকেই ভালো লাগে ? লাগিয়ে নিতে হয় : যেন নিজের বিরুদ্ধেই জোর করে জবাব দিলে মীরা।

বেণু পায়ের কাছে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। নিঃশব্দ। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ছে, কলেজে 'নটীর পূজা' অভিনয়ের সময় এই মীরাই নেমেছিল শ্রীমতীর ভূমিকায়। কী আশ্চর্য শুচিস্মিত মনে হয়েছিল—এখনো কানে

বাজছে : বুদ্ধ, থমতু সে। কিন্তু আজ আর কিছুই মিলছে না—কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সমস্ত।

তোদের সে মহিলা আশ্রম কোথায়? কলকাতায়? —আবার প্রশ্ন শোনা গেল মীরার।

না, বাইরে। বেলঘরিয়া থেকে যেতে হয়।

পাড়াগাঁয়ে? অসুবিধে হয় না?

এক-আধটু হয় বই কি। কলকাতার সুযোগ-সুবিধে তো আর পাওয়া যায় না, কী করা যাবে বল্? রিফিউজী মেয়েদের নিয়ে কাজ—সব রকম বাধার ভেতর দিয়েই চলতে হয়।

চা আর কাটলেট নিয়ে এল বেয়ারা।

নে, খা।

কাটলেটের একটা টুকরো মুখে দিয়েই বেণু ফর্কটা নামিয়ে রাখল।

কী হল?

হয় নি কিছু।—ফস করে একটা অশোভন প্রশ্ন করে বসল বেণু : আচ্ছা, কত বিল হবে এ-সব খাবারের?

তুলিতে আঁকা ভ্রূ-দুটো একসঙ্গে জুড়ে এল মীরার : এ-সব প্রশ্ন কেন হঠাৎ?

এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। কত বিল দিতে হবে তোকে?

কত আর?—একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করল মীরা : টাকা আড়াই বড় জোর।

আড়াই টাকা!—বেণু যেন স্বগতোক্তি করল : একবেলা দুধ হয়ে যেত আশ্রমের বাচ্চাগুলোর।

চাবুকের মতো কথাটা গায়ে এসে লাগল। বেণু কি আঘাত করতে চায় তাকে? ব্যঙ্গ করতে চায় ওর রাজনীতির আভিজাত্য থেকে? ক্রোধে অপমানে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মীরা। সেলোফোন কাগজের মতো চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

পৃথিবীতে অনেক ভালো কাজই করবার আছে। কিন্তু সবাই সব করতে পারে না।

তা ঠিক।—বেণু বিমর্ষ গলায় সায় দিল, প্রতিবাদ করল না। তার পর কাটলেটটা ফেলে রেখে, তিন চুমুকে চা-টা শেষ করে ফেলল। অস্বস্তিভরে বললে, তুই ধীরেসুস্থে খা ভাই, আমি যাই।

সেকি! কী হল তোর?—কাটলেটের একটা টুক্‌রো ছিঁড়তে ছিঁড়তে থেমে গেল মীরা।

সাতটা বেজে গেছে। আটটা পাঁচের ট্রেনটা আমার ধরতেই হবে। ওদিকে অনেক কাজকর্ম আছে, তা ছাড়া নিজের বাচ্চাটাও কান্নাকাটি জুড়ে দেবে! ওঁরও বিস্তর ঝামেলা থাকে সন্ধ্যেবেলায়।

মীরার মুখ কালো হয়ে গেল: আচ্ছা, যা তুই।

রাগ করছিস?—বেণু বিব্রত হাসি হাসল: কী করব ভাই, কোনো উপায় নেই আমার। শুধু একটা কথা আজ বলতে এসেছিলাম তোকে। তুই তো বেশ চাকরি-বাকরি করছিস আজকাল। কিছু সাহায্য কর্ না গরিব বাস্তুহারাদের।

কালো মুখখানা আরও কালো হয়ে এল মীরার। নতুন মাইনে পাওয়া ব্যাগটাকে চেপে ধরল বাঁ-হাতের মুঠোর মধ্যে। একটু আগেই বেণু তাকে আঘাত করছিল, এবার সে প্রতিঘাত করবে।

এ-মাসে পারব না।—ইচ্ছে করে শুনিয়ে শুনিয়েই মীরা বললে, দুটো নতুন শাড়ি কিনতে হবে আমাকে। দেখে রেখেছি মার্কেটে।

ছিটের ময়লা ব্লাউজ আর ডুরে শাড়ি-পরা বেণু সপ্রতিভ হাসি হাসল: বেশ, তা হলে আমার বাচ্চাদের জন্যে না হয় কিছু খেলনাই ডোনেট্ কর।

গলার স্বরে যথাসম্ভব তিক্ততা মিশিয়ে মীরা বললে, দোকানের মালিক আমি নই, মিস্টার পালিয়া। তাঁর জিনিস নিয়ে চ্যারিটি করবার জন্যে তিনি আমার চাকরি দেন নি।

অদ্ভুত নির্লজ্জ বেণু, তবু দমল না: আচ্ছা, তা হলে কিছু

টাকাই দিস আসছে মাসে। আমি আবার আসব।—দরজার দিকে দু' পা এগিয়ে গিয়ে ফিরে তাকালো একবার : কিছু মনে করিস নি ভাই, আটটা পাঁচের ট্রেনটা ধরতেই হবে আমাকে।

ময়লা কাবলী জুতোর শব্দটা নেমে গেল বাইরে।

হিংস্র চোখে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল মীরা। তার পর চিংড়ির কাটলেট্‌টাকে আশ্চর্য বিস্বাদ মনে হল তার। চায়ে চুমুক দিয়ে দেখল জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে সেটা।

অদ্ভুত তীক্ষ্ণ গলায় মীরা ডাকল : বোয়!

বয় আসবার আগেই যেন আকাশ থেকে একটি পাঞ্জাবী ছোকরা নেমে এসে বেণুর চেয়ারটায় বসে পড়ল। মীরাকে চেনে। তার দিকে তাকিয়ে শ্বাপদের মতো রক্তিম একটুকরো হাসি ফুটে উঠল মীরার ঠোঁটের কোনায়। এ হাসি আলাদা—দোকানের কোনো খরিদ্দার কখনো দেখে নি—বেণুও না।

আরও দেড়ঘণ্টা পরে।

শুধু চারদিকের নিয়নগুলোই দপ্‌দপ করছে না—মীরার রক্তেও আগুন জ্বলছে, চোখদুটোও জ্বলজ্বল করছে—কিন্তু ধার-করা উজ্জ্বলতায় নয়। এ চোখ বেণু দেখেনি—দেখবার সাহসও নেই বেণুর।

হঠাৎ মীরার হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। আশ্রম—বেলঘরিয়া। জংলা পথ দিয়ে থমথমে অন্ধকারে ছেঁড়া কাবলী জুতোয় হোঁচট খেতে খেতে বেণু হয়তো হেঁটে চলেছে এখনো। দূর থেকে হয়তো তার শিশুর কান্নাই শুনতে পাচ্ছে সে। আর কত আলো এখানে—কী অজস্র আলো! এ আলোয় একটা ছুঁচ মাটিতে পড়ে গেলেও কুড়িয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু—কিন্তু—হঠাৎ গলায় একটা কাঁটা বেঁধার মতো মনে পড়ল : অথচ একটি পরিচয়হীন শিশু কোন্ অনাথ আশ্রমে এ আলোয় হারিয়ে যায় কেউ তার সন্ধানও পায় না! চারদিকের শব্দের ঘূর্ণি ভেদ করে তার কান্না এসে একবারও স্পর্শ করে না মীরাকে।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সামনেই তার দোকান। এখন বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু শো-কেসের উজ্জ্বল আলোয় ঝকঝক করছে কয়েকটা খেলনা: একটা ডল—ছুটো মেকানো সেট, কতকগুলো প্লাস্টিকের খুঁটিনাটি—একটা কর্ক-গান!

খেলনাগুলোর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে এল মীরার। বেণুর জন্যে এরা নয়। কিন্তু গোত্রহীন যে শিশু অজানা অনাথ আশ্রমে ঠাঁই পেয়েছে, তারও কি এতটুকু দাবি আছে এদের উপর?

একবার বোবা যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠতে চাইল মীরা। মনের মধ্যে থেকেও আর্তনাদের মতো প্রশ্ন উঠল: বেলঘরিয়া যাওয়ার এখনো কি কোনো ট্রেন আছে? এখনো কি আশা আছে তার? এখনো ছুটে গিয়ে বেণুকে কি বলা যায়—

না—যায় না। বড় অন্ধকার। সে অন্ধকারে শুধু বেণুরাই পথ চলতে পারে—মীরা পারবে না। চারদিকের আলো—রাশি রাশি উগ্র আলো মদের নেশার মতোই খেলা করে বেড়াচ্ছে তার রক্তে। এর হাত থেকে তার পরিত্রাণ নেই! মরণের কাছে দাসখৎ দেওয়া পোকার মতো এই আলোর বৃত্ত পরিক্রমা ছাড়া উপায়ান্তর নেই তার।

কিন্তু বেণুর অন্ধকারের শেষে তো একটা আশ্রয় আছে। এই আলোর শেষে? এই উজ্জ্বল নির্লজ্জতার শেষ সীমান্তে কী আছে মীরার জন্যে?

কাচের শো-কেস্‌টাই আপাতত ভেঙে ফেলতে পারে মীরা—ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে খেলনাগুলো। আর—আর তুলে নিতে পারে কর্ক-গানটাকে। কিন্তু মীরা এও জানে: কর্ক-গান থেকে শুধু শব্দ আর ধোঁয়াই বেরিয়ে আসে, তার বেশি আর কিছুই হয় না।

পান্থ-নিবাস

কী দাদা, ঘুম ভাঙল ?

প্রশ্নটা অনাবশ্যক, কারণ দাদা নিশ্চয়ই এই সকাল সাড়ে ছটায় ঘুমন্ত অবস্থায় দরজা খুলে প্রকৃতির শোভা দেখছেন না। আরও বিশেষ করে তাঁর গায়ে যখন একখানা শাল জড়ানো এবং হাতে একটা জ্বলন্ত চুরুট। কিন্তু দাদা আশ্চর্য হলেন না। প্রাত্যহিক আলাপের অভ্যস্ত ভূমিকার সঙ্গে তিনিও সৌজন্যের দন্তরুচি বিকাশ করলেন।

রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো ?

মন্দ নয়—এবার উত্তর দিয়ে দাদা অনুজকে কৃতার্থ করলেন।

বলা দরকার, এখানে দাদাত্বের সঙ্গে বয়সের কোনো সম্পর্ক নেই। 'মশায়ের' প্রথম ধাপটা পেরুলেই মিউচুয়্যাল 'দাদায়ন'। অন্তরঙ্গতার অকৃত্রিম অভিব্যক্তি। বাঙালীর জাতীয় ঐতিহ্য।

টাইগার হিলে যাবেন নাকি কাল সকালে ?

আজ আকাশের অবস্থাটা দেখি একবার। বৃষ্টি হবে না বোধ হচ্ছে। কী বলেন ?

ওয়েদার তো ভালোই যাচ্ছে কাল থেকে। তবে দার্জিলিঙের ব্যাপার তো—ডেফিনিট বলা যায় না কিছুই। ভালো কথা— গরম কোটটা তৈরি হয়ে গেছে আপনার ?

চা খেয়েই বেরুব ট্রায়াল দিতে। চলুন না একবার সঙ্গে। আপনার তো এক্স্পার্ট চোখ !

দার্জিলিং শহরে মে মাস। একটি পান্থশালায় প্রভাতী জাগরণ।

ব্যারাকের মতো ব্লকটার সামনে দিয়ে কাঠের লম্বা করিডোর —কাচের আভরণে ঢাকা। ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় অর্ধচন্দ্রাকার একটি লাউঞ্জ—কয়েকটি বসবার আসন। সেইখান থেকেই কথালাপ কানে আসছিল।

কম্বলের উত্তপ্ত আশ্রয়ে আধো ঘুমের ভেতরেই আলাপ-আলোচনা শুনছিলাম। কিন্তু আর লম্বমান থাকা গেল না বেশিক্ষণ। হঠাৎ দুম্‌দাম্‌ শব্দে সমস্ত ব্লকটা কেঁপে উঠল—মনে হল হর্স রেস শুরু হয়ে গেছে করিডোরটার ওপরে। না—ঘোড়া নয়। এক নম্বর আর দু-নম্বর ঘর থেকে মাড়োয়ারী পরিবারের সেই উত্তরকাল বেরিয়ে এলেন—যাঁদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'ইহাদের করো আশীর্বাদ।' রবীন্দ্রনাথ আরও জানিয়েছিলেন যে এরাই 'নন্দনের এনেছে সংবাদ'।

এরাই যদি 'নন্দনের' বার্তাবহ হয়ে থাকে, তবে নন্দন সম্পর্কে খুব উৎসাহিত হওয়ার কারণ নেই—আমি বলতে বাধ্য। পদধ্বনি দিয়ে শুরু হয়েছে, তার পরিণতি ঘটবে অমানুষিক চিৎকারে এবং আসুরিক কান্নায়। সুতরাং উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।

সামনে করিডোরের পর্ব চলতে থাকুক—আমি দরজা খুলে পেছনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। পান্থশালার এ অংশটুকু হরিজন। সারি সারি বাথরুমের তলা দিয়ে খোলা ড্রেন। তার-পরেই তিন-চার হাত চওড়া জমি একটা আকস্মিক খাড়াইয়ের মধ্যে ফুরিয়ে গেছে। আকাশ যেদিন পরিষ্কার থাকে—সেদিন অবশ্য এখান থেকে ভারী চমৎকার দেখায় কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। দল বেঁধে সবাই জড়ো হয়, বাইনোকুলার ঘুরতে থাকে হাতে হাতে, ক্যামেরার শব্দ ওঠে ক্লিক্‌ ক্লিক্‌। কিন্তু আজ সামনের আকাশটা নিবিড় কুয়াশা দিয়ে ছাওয়া—কণায় কণায় জল নিয়ে ফগ্‌ উড়ে আসছে—খানিক দূরের পাইন গাছগুলো পুরোনো দীঘির জলের তলায় কালো শ্যাওলার মতো অস্পষ্ট।

একা দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নিশ্বাসে নিশ্বাসে ফগ্‌ টানা গেল। বন্ধ ঘরের গুমোট চাপটা একটু একটু করে সরে যাচ্ছে যেন ফুস্‌ফুস্‌ থেকে। শিরশিরে হাওয়ায় জুড়িয়ে আসছে মাথাটা।

কিন্তু না—এখানেও দাঁড়াতে দিল না।

তিন নম্বর ঘরের পাঞ্জাবী মেয়েটির সঙ্গে ছ-নম্বরের মারাঠী

পান্থ-নিবাস

কী দাদা, ঘুম ভাঙল ?

প্রশ্নটা অনাবশ্যক, কারণ দাদা নিশ্চয়ই এই সকাল সাড়ে ছটায় ঘুমন্ত অবস্থায় দরজা খুলে প্রকৃতির শোভা দেখছেন না। আরও বিশেষ করে তাঁর গায়ে যখন একখানা শাল জড়ানো এবং হাতে একটা জ্বলন্ত চুরুট। কিন্তু দাদা আশ্চর্য হলেন না। প্রাত্যহিক আলাপের অভ্যস্ত ভূমিকার সঙ্গে তিনিও সৌজন্যের দন্তরুচি বিকাশ করলেন।

রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো ?

মন্দ নয়—এবার উত্তর দিয়ে দাদা অনুজকে কৃতার্থ করলেন।

বলা দরকার, এখানে দাদাত্বের সঙ্গে বয়সের কোনো সম্পর্ক নেই। 'মশায়ের' প্রথম ধাপটা পেরুলেই মিউচুয়্যাল 'দাদায়ন'। অন্তরঙ্গতার অকৃত্রিম অভিব্যক্তি। বাঙালীর জাতীয় ঐতিহ্য।

টাইগার হিলে যাবেন নাকি কাল সকালে ?

আজ আকাশের অবস্থাটা দেখি একবার। বৃষ্টি হবে না বোধ হচ্ছে। কী বলেন ?

ওয়েদার তো ভালোই যাচ্ছে কাল থেকে। তবে দার্জিলিঙের ব্যাপার তো—ডেফিনিট বলা যায় না কিছুই। ভালো কথা—গরম কোটটা তৈরি হয়ে গেছে আপনার ?

চা খেয়েই বেরুব ট্রায়াল দিতে। চলুন না একবার সঙ্গে। আপনার তো এক্‌স্‌পার্ট চোখ !

দার্জিলিং শহরে মে মাস। একটি পান্থশালায় প্রভাতী জাগরণ।

ব্যারাকের মতো ব্লকটার সামনে দিয়ে কাঠের লম্বা করিডোর —কাচের আভরণে ঢাকা। ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় অর্ধচন্দ্রাকার একটি লাউঞ্জ—কয়েকটি বসবার আসন। সেইখান থেকেই কথালাপ কানে আসছিল।

কম্বলের উত্তপ্ত আশ্রয়ে আধো ঘুমের ভেতরেই আলাপ-আলোচনা শুনছিলাম। কিন্তু আর লম্বমান থাকা গেল না বেশিক্ষণ। হঠাৎ দুম্‌দাম্ শব্দে সমস্ত ব্লকটা কেঁপে উঠল—মনে হল হর্স রেস শুরু হয়ে গেছে করিডোরটার ওপরে। না—ঘোড়া নয়। এক নম্বর আর দু-নম্বর ঘর থেকে মাড়োয়ারী পরিবারের সেই উত্তরকাল বেরিয়ে এলেন—যাঁদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'ইহাদের করো আশীর্বাদ।' রবীন্দ্রনাথ আরও জানিয়েছিলেন যে এরাই 'নন্দনের এনেছে সংবাদ'।

এরাই যদি 'নন্দনের' বার্তাবহ হয়ে থাকে, তবে নন্দন সম্পর্কে খুব উৎসাহিত হওয়ার কারণ নেই—আমি বলতে বাধ্য। পদধ্বনি দিয়ে শুরু হয়েছে, তার পরিণতি ঘটবে অমানুষিক চিৎকারে এবং আসুরিক কান্নায়। সুতরাং উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।

সামনে করিডোরের পর্ব চলতে থাকুক—আমি দরজা খুলে পেছনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। পান্থশালার এ অংশটুকু হরিজন। সারি সারি বাথরুমের তলা দিয়ে খোলা ড্রেন। তার-পরেই তিন-চার হাত চওড়া জমি একটা আকস্মিক খাড়াইয়ের মধ্যে ফুরিয়ে গেছে। আকাশ যেদিন পরিষ্কার থাকে—সেদিন অবশ্য এখান থেকে ভারী চমৎকার দেখায় কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। দল বেঁধে সবাই জড়ো হয়, বাইনোকুলার ঘুরতে থাকে হাতে হাতে, ক্যামেরার শব্দ ওঠে ক্লিক্ ক্লিক্। কিন্তু আজ সামনের আকাশটা নিবিড় কুয়াশা দিয়ে ছাওয়া—কণায় কণায় জল নিয়ে ফগ্ উড়ে আসছে—খানিক দূরের পাইন গাছগুলো পুরোনো দীঘির জলের তলায় কালো শ্যাওলার মতো অস্পষ্ট।

একা দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নিশ্বাসে নিশ্বাসে ফগ্ টানা গেল। বন্ধ ঘরের গুমোট চাপটা একটু একটু করে সরে যাচ্ছে যেন ফুস্‌ফুস্ থেকে। শিরশিরে হাওয়ায় জুড়িয়ে আসছে মাথাটা।

কিন্তু না—এখানেও দাঁড়াতে দিল না।

তিন নম্বর ঘরের পাঞ্জাবী মেয়েটির সঙ্গে ছ-নম্বরের মারাঠী

ছেলেটি একটু বেশি অন্তরঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে। ওদের নিয়ে কিছু দিন থেকেই একটা চাপা কানাকানি চলছে পান্থ-নিবাসে। আরও শোনা আছে, ভীমকায় পাঞ্জাবী পিতৃদেব এই পূর্বরাগটুকু আদৌ পছন্দ করেন না, কারণ কলকাতায় কোন্ মোটর-ব্যবসায়ীর সঙ্গে নাকি ইতিপূর্বেই মেয়েটি বাগ্‌দত্তা।

কিন্তু ওটা পারিবারিক ব্যাপার—আমার আওতায় পড়ে না। আমি কেন অকারণে ছন্দপতন ঘটাই ওদের বিশ্রম্ভ-বিলাসে? অগত্যা বাথরুমে হাত মুখ ধুয়ে আবার ফিরতে হল করিডোরের দিকেই।

সামনে মস্ত লন। সীজন ফ্লাওয়ার, গন্ধহীন গোলাপ আর তোড়ার মতো থোকা বাঁধা নীল-শাদা হাইড্রেন্‌জিয়া। দুটো চারটে ক্যাক্‌টাস্—তাদের একটায় ম্যাগ্‌নোলিয়ার মতো সমস্ত একটা শাদা ফুল ফুটেছে। ডালিয়ার ছেঁড়া পাপড়ির মতো উড়ন্ত প্রজাপতি। মাথার ওপরে একদিকে রেলস্টেশনে এঞ্জিনের ধোঁয়া—অন্যদিকে সারি সারি পাইন গাছের ছায়ায় একটা বৌদ্ধ গুম্ফার গম্ভীর মূর্তি।

কিন্তু সুর কেটে যায়। তখনি চোখে পড়ে ঠিক স্টেশনের নিচেই খানিকটা ভাঙাচুরো বাঁধানো জায়গা—একটা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। দার্জিলিঙের বিখ্যাত ধসের সময় একটি গরীব বাঙালী রেলের কেরানী ওখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সপরিবারে। ডেমোক্লিসের তলোয়ারের মতো অশুভভাবে ওটা দাঁড়িয়ে আছে মাথার ওপরে। অস্বস্তি লাগে—নামিয়ে আনতে হয় দৃষ্টি।

ওদিকের আর-এক ব্লক থেকে বাসন্তী রঙের শাড়ি পরা একটি মেয়ে উদাসিনীর মতো লনে নেমে এল। গায়ে ফিকে নীল একটি ওভারকোট—কিন্তু বোতাম আঁটা হয় নি। কোটের পকেটে হাত দিয়ে মন্থর গতিতে পায়চারি করতে লাগল।

কোনো এক মিস্ রায়। স্বাধীন এবং স্বাবলম্বিনী। দিনের মধ্যে বার দশেক শাড়ি বদলান—অন্তত গোটা তিনেক কোট পরতে দেখা গেছে ওঁকে। চলাফেরায় মধ্যে একটা উদাস বিরহ

ঘনিয়ে থাকে সব সময়ে। দেখে মনে হয়, হয় প্রেমে পড়েছেন নইলে ভুগছেন টি-বিতে।

কিন্তু সত্যি নয় কোনোটাই। কারণ পান্থশালার ক্লাব ঘরটিতে উনি মক্ষিরানী। সেখানে একদল ছোকরার সঙ্গে কোলাহল করে টেবল-টেনিস খেলেন, অকৃপণ হাসির করুণা-কণা বিতরণ করেন সকলকেই। কোনো কোনো দিন বন্ধুদের নিয়ে নাকি ওঁকে 'বারে' ঢুকতে দেখা যায় এবং মুখে থাকে জ্বলন্ত সিগারেট।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে মেয়েটিকেই দেখছিলাম। বেশ রোম্যাণ্টিক লাগছে অস্বচ্ছ সকালের আলোয়। কিন্তু সামনা-সামনি যে দু-চারবার ভদ্রমহিলাকে দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গেই কুঁকড়ে গেছে সমস্ত মন। স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে নির্বুদ্ধিতা মিশলে একটি সুশ্রী মেয়ের মুখও কত কুৎসিত দেখাতে পারে—তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন যেন।

ও লা- লা—লা—

গগনভেদী চিৎকার একটা। ট্রাউজার আর বুশ্ শার্টের ওপরে স্লিপ-ওভার চড়িয়ে দুটি তেইশ চব্বিশ বছরের ছেলে যেন হঠাৎ আকাশ থেকে আছড়ে পড়ল লনের ওপর। একজনের হাতে একটা সিগারেটের টিন—সেইটে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সে ছুটছে—আর একজন প্রাণপণে তাড়া করছে তাকে।

মাইরি দিয়ে দে বলছি। ভালো হবে না নইলে—

কেন, বাজী রাখবার সময় মনে ছিল না ? এটা এখন আমার—

দু'জনে হাত কাড়াকাড়ি আরম্ভ করল। একটা বীভৎস তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল বলতে গেলে।

মিস্ রায় দাঁড়িয়ে মিটমিট করে হাসছিলেন। যে ছেলেটির হাতে সিগারেটের টিন, সে হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

এই যে আপনি রয়েছেন। আপনিই বিচার করুন—

লাউঞ্জের মধ্য থেকে চ্যাঁ করে কান-ফাটানো কান্নার আওয়াজ উঠল একটা। মাড়োয়ারী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এতক্ষণ বাহুবল পরীক্ষা চলছিল, এইবারে একজন বিধ্বস্ত হল।

এ মুন্নু—এ সরযু—

স্বত্বাধিকারী অভিভাবকের একটা খ্যারখেরে গলার ধমক শুনতে পাওয়া গেল।

শিশুপাল বধ দেখব, না লনের নাটকটা উপভোগ করব ঠিক করার আগেই ট্যাং ট্যাং করে ঘণ্টা বাজল। ডাইনিং হলে প্রভাতী চা-পানের আহ্বান। তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো ছুটলাম সেদিকেই।

গৌরবে বহুবচন। ডাইনিং হল। ঘরটির চেহারা কলকাতার পাইস্ হোটেলের চাইতে লোভনীয় নয়। মেজেতে সারি সারি লম্বা লম্বা সিমেণ্টের বেদী—তাদের গায়ে গায়ে বিজ্ঞপ্তি লটকানো: ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ ইত্যাদি। অর্থোডক্স ব্লকে আমরা আছি, এক জাত আর-এক জাতের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজন করে পৈতৃক ধর্মকর্ম নষ্ট না করি, তারি জন্যে এই সতর্কতা। আগে খুব কড়াকড়ি ছিল, এখন আর পঙ্‌ক্তির নিয়মটা কেউ মানে না।

কিন্তু গীতায় যখন শ্রীভগবান গুণ-কর্ম বিভাগ করেছিলেন, তখন চা-পান সম্বন্ধে কিছু বলে যান নি যুযুৎসু অর্জনকে। সুতরাং এহেন অর্থোডক্স ভোজনশালাতেই ম্লেচ্ছমতে চা-পানের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। ঘরের তিনদিকে কাঠের দেয়াল ঘেঁষে বইয়ের শেলফের মত সরু সরু কাঠের ফালি সমান্তরালভাবে বসানো। ভোজনপর্ব মেজেতে বসে সারতে হয় বটে, কিন্তু চায়ের বেলায় এই কাঠের দাঁড়ে উঠে বসতে হয়।

কড়াইশুঁটি সহযোগে চিঁড়ে ভাজা। ফ্রুট নামে দু-টুকরো পেঁপে আর একটা ছোট মিষ্টির টিফিন এল। সেই সঙ্গে বেশ বড় সাইজের পেয়ালায় চা।

আহারে মনোনিবেশ করি। একটি আন্তর্জাতিক সমাবেশ চারপাশে। পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুর্জর-মারাঠা-দ্রাবিড়-বঙ্গ। উৎকলটা বাদ গেল—উৎকলীয় কেউ আছেন কিনা এখনো চোখে পড়ে নি।

চিঁড়ে-ভাজা চিবোনোর একটা দাম্ভিক ঐকতান। ব্যতিব্যস্ত পাহাড়ী বেয়ারাগুলোর প্রতি নানা গলার ধমক: চা লাও, টিফিন লাও। তারি ভেতরে আবার মাতৃভাষায় আলাপচারী শুনছি।

কাল ওজন নিয়েছিলেন দাদা? ক-পাউণ্ড বাড়লো?

গালটায় একটু গোলাপী রঙ্ ধরেছে এই ক-দিনে—কী বলেন? কাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলুম।

আজ পেটের অবস্থা কেমন আপনার? সারলো?

কই আর সারলো! এখনো ভুট্‌ভাট্ করছে। তার উপরে খাচ্ছি চিঁড়ে ভাজা। কী হবে কে জানে।

চিঁড়ের দোষ নেই মশাই—ওতে কিছু হবে না। তখন তো কথা শুনলেন না। এত পইপই করে বললুম, দাদা, এখানকার কাঁচা জল খাবেন না—খাবেন না। বেজায় ডেঞ্জারাস্। তখন কানেই তুললেন না—বুঝুন এবার।

কী করি বলুন তো? হিল ডাইরিয়া-ফাইরিয়া হবে না তো শেষ পর্যন্ত?

বেশ লাগছিল—হঠাৎ 'ধ্বনি তরঙ্গিল নিবিড়-সংগীতে।' ঝন্‌ঝন্ করে একটি কাপ পড়ল মেঝেতে—ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, এধারের ভদ্রলোকটি উচ্ছলিত গরম চায়ের স্পর্শসুখে আর্তনাদ করে উঠলেন।

ব্যাপারটা সংক্ষিপ্ত। চায়ের ঘণ্টার আওয়াজে করিডোরের সংগ্রাম পর্ব থেমেছিল সাময়িকভাবে। কিন্তু টেবিলে বসে আট বছরের হনুমান দাস একটা ঘুষি হাঁকড়েছে ছ-বছরের মুন্নুলালের উদ্দেশে। ঘুষিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লেগেছে চায়ের কাপে এবং তারপর—

চা-হত ভদ্রলোক আহত হৃদয়ে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেলেন। সদ্য ধোপ-ভাঙা পাজামাটায় এখনি সাবান দিলে হয়তো কিঞ্চিৎ আশা আছে।

ঘরের তত্ত্বাবধায়ক হাঁড়ির মতো মুখ করে এগিয়ে এলেন।

দেখিয়ে জী, রোজ এক্‌ঠো এক্‌ঠো করে এইসা কাপ ভাংনেসে—

হনুমান দাসের পিতৃদেব চটে উঠলেন: তোড়া তো হুয়া ক্যা? লড়্‌কা লোক অ্যায়সা করতাই হ্যায়। যাও—যাও—হামরা ঘর্‌মে তুমারা কাপকো বিল ভেজ দো—

চাঁদির জুতো। তত্ত্বাবধায়ক বিড়বিড় করতে করতে সরে গেলেন, ওঃ—ভারী গরম হয়েছে টাকার!

উঠে পড়ি। এবার একটু বেরুতে হবে।

লনের ভেতর দিয়ে ঘরে ফিরছি, সঙ্গ নিলে স্টোন ব্লকের কাঞ্চন বাঁড়ুয্যে।

বি-এ পরীক্ষা দিয়ে বেড়াতে এসেছে দার্জিলিঙে। অনার্স-পড়া ভালো ছাত্র—ফেলের দুর্ভাবনা নেই। কবিতা লেখবার বাতিক আছে। কলকাতায় বন্ধুদের কাছে আমল পায় না, ঠিক করেছে, দু-মাস দার্জিলিঙে থেকে অমর কাব্য রচনা করে নিয়ে যাবে।

কি হে কাঞ্চন, নতুন সৃষ্টি হল কিছু ?

কাল রাত দুটো পর্যন্ত লিখেছি দাদা। ছ'টা কবিতা।

বলো কী! এই শীতের মধ্যে রাত দুটো পর্যন্ত কাব্যচর্চা ?

কী করব দাদা ? কাঞ্চন প্রায় আধ্যাত্মিক হাসি হাসল : হঠাৎ মুড এসে গেল। যতই থামতে চাই, কিছুতেই আর কলম থামে না। কাচের জানলার ভেতর দিয়ে আতশবাজির মতো যতই বাইরের আলোগুলোর দিকে তাকাই, ততই আইডিয়াগুলো একটার পর একটা সার দিয়ে এসে দাঁড়ায়।—অপরাধীর গলায় কাঞ্চন বললে, দু-একটা শুনবেন দাদা ?

এখন নয় ভাই—সন্ত্রস্তভাবেই জবাব দিই : একটু বেরুতে হবে।

কাঞ্চন নিরাশ হয় বটে, কিন্তু দমে যায় না : আচ্ছা দুপুরে হবে তাহলে।

আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার, রৌদ্র আর কুয়াশার খেলা চলেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা আধঘণ্টার জন্যে একটুখানি দেখা দিয়েছিল, এখন আবার হারিয়ে গেছে একটা নিশ্ছেদ শাদা পর্দার আড়ালে।

ম্যালে উঠে এলাম।

বসবার জায়গা একটিও খালি নেই। নানারঙের কোট, ওভারকোট, ছাতা আর বর্ষাতির মেলা বসেছে। কয়েক বছর আগেও ধুতি-চাদর চোখে পড়ত—এখন তারা নির্বাসিত বললেই হয়।

অশ্বারোহণের বিচিত্র অধ্যায় আশেপাশে। চল্লিশ বছরের ভুঁড়ো ভদ্রলোক খর্বকায় টাট্টুর পিঠে কম্পমান—তেরো-চৌদ্দ

বছরের একটি ভুটিয়া মেয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছে। সামনের সাজানো দোকান থেকে মনোহারী জিনিসের হাতছানি। ঝকঝকে মেয়েদের ধারালো হাসির কল-ঝংকার। দামী গরম জামা গায়ে চড়াবার একটা প্রাণান্তিক প্রতিযোগিতা।

শুধু সাড়ে ছ-হাজার ফুট নয়, তারও চেয়ে অনেক ওপরে এই দার্জিলিং। এখানে এলে মনে হয় আকাশটা মাথায় অনেক-খানি কাছাকাছি এসে পড়েছে—কেমন করুণা হয় সমতলের মানুষগুলোর ওপরে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের রোদে পোড়া মাঠকে মনে পড়ে না—দুর্ভিক্ষের ছায়া-নামা গ্রামগুলোকে ভুলে যাওয়া চলে, ভুলে যাওয়া চলে ঠিক এই বেলা এগারোটার সময় বীরভূমের আর বাঁকুড়ার মানুষ শুকনো পাহাড়ী নদীর গরম বালু খুঁড়ছে তৃষ্ণার জলের আশায়। মনেই থাকে না, মধ্যবিত্ত ঘরের ম্যাট্রিক পাস মেয়ে চাকরির চেষ্টায় ঘুরতে বেরিয়ে এই মুহূর্তেই অসহ্য গরমে একটা বাস স্ট্যাণ্ডের পাশে অচেতন হয়ে পড়ল—কাল রাত থেকে ঘরে তার খাবার ছিল না!

হংসের দলে বকের মতো ঘুরতে থাকি। আমার পরনে ধুতি—টুইডের লম্বা কোটটা কুলীন জাতের নয়, আকারে প্রকারে ধুশো কম্বলের সগোত্র। পায়ের কাবুলী চটি দীনতায় ম্লান। চারদিক থেকে যেন অনুকম্পার দৃষ্টি এসে আমাকে আঘাত করছে। ম্যাল্ থেকে সরে পড়লাম।

নিচের বাজারমুখী রাস্তাটা দিয়ে নামছি, এমন সময় সম্ভাষণ: কী দাদা, এখনি ফিরছেন যে বড়?

পান্থ-নিবাসের আর একটি। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, গোলগাল মুখ, ফর্সা রং—মাথার সামনের দিকে ছোট একটি টাক। জেনারেল ব্লকে থাকেন—দিলদরিয়া লোক। সব সময়ে চার-পাঁচ রকমের সিগারেট রাখেন সঙ্গে—অফার করেন অকৃপণভাবে। পেশায় অ্যাটর্নি, কিন্তু অ্যাটর্নিগিরি করবার দরকার হয় না। বাপের টাকা আছে, দিদিমা নাকি সাতখানা বাড়ি দিয়ে গেছেন।

ভদ্রলোক কী এক মিস্টার চাকলাদার। শোনা যায় তিনি

নাকি অতিশয় রসিক। আমি অবশ্য তাঁর সেই রসিকতার বিশেষ কোনো পরিচয় পাই নি। শুনেছি, মেয়ে-মহলেই নাকি তাঁর দুর্দান্ত পসার এবং কলকাতার একটি অঞ্চলে নাকি তাঁর অনুরাগিনীর সংখ্যা আঙুলে গুণে শেষ করা যায় না।

চাকলাদারকে কোনো জবাব দেবার আগেই তিনি ধাঁ করে একটা চৌকো সিগারেট বাড়িয়ে দিলেন আমাকে: নিন্ দাদা—ইজিপ্সীয়ান্ ব্লেন্ড্!

নিলাম। ফস্ করে লাইটারটা তিনিই জ্বেলে ধরলেন। তার পর আতিথেয়তা শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন: ম্যালে নতুন কাকে দেখলেন আজ?

মানে?

ডলি লাহিড়ীদের আসবার কথা ছিল, মিসেস্ মিত্রও আসবেন রুবি আর ববিকে নিয়ে, তা ছাড়া কর্নেল চ্যাটার্জির মেয়ে সবিতারও আসবার খবর শুনেছিলাম ওর ফিয়াসেঁর সঙ্গে। দেখলেন কাউকে?

মাপ করবেন, ঠিক বলতে পারব না। ওঁদের কাউকেই আমার চেনা নেই।

তা বটে, ওঁদের চেনা যায় না—দে আর্ এভার সো মিস্টিরিয়াস! চাকলাদার এবার হা হা করে হাসলেন, সম্ভবতঃ এইটে তাঁর বিখ্যাত রসিকতার একটি। তার পর হাসি থামিয়ে বললেন, চলুন না, দু-একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

আর একদিন হবে, আজ থাক। আমি সবিনয়ে পাশ কাটালাম। একটা বিলিতী সুর শিস্ দিতে দিতে চাকলাদার চললেন ডলি লাহিড়ীদের সন্ধানে।

পান্থ-নিবাসে পা দিতে দেখি, আর একটা নতুন পর্ব শুরু হয়েছে। লন জুড়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছে এখন। নানী—অর্থাৎ ঠিকে আয়ারা রোদে বসে ক্রুশ বুনছে আর মাঝে মাঝে ধমক দিচ্ছে বাচ্চাদের। স্বাস্থ্যান্বেষী বড়রা এখনো বেড়িয়ে ফেরে নি—দু-চারজন মাত্র ঘুরছে এদিক ওদিক। তাদেরই একজন পূর্ণোৎসাহে বাচ্চাদের সঙ্গে মেতেছে একটা রবারের বল নিয়ে।

বছর কুড়ি বাইশের ছোকরা। মাথায় জকি ধরনের টুপি, গায়ে লেদার জ্যাকেট। কলকাতার কোন্ বিখ্যাত প্রসাধন প্রতিষ্ঠানের বংশধর।

কিন্তু হঠাৎ বাচ্চাদের সঙ্গে কেন? এর জায়গা তো এটা নয়। ছোকরার একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে এবং সে দুর্বলতার খবর সকলেরই জানা। দার্জিলিঙে এলে প্রেমে পড়বার সুযোগ মেলে এমনি একটা ধারণা নিয়ে এসেছে। তাই পান্থ-নিবাসের প্রতিটি মেয়ের পেছনেই ছুটে বেড়ায়। কিন্তু তোতলামি আর ক্যাব্লামির জন্যে কেউ ওকে আমল দেয় না—এমন কি করুণাময়ী মিস্ রায়ও নয়।

তাই কি মনের দুঃখে বাচ্চাদের দলে ভিড়ল? কিন্তু এখানেও সুবিধে হবে না—আমি মনে মনে ভাবলাম। আট বছরের হনুমান দাস কাছাকাছি কোথাও নেই—একবার এসে পৌঁছুলে সেই-ই ওকে 'নক্ আউট' করে দেবে!

"তোমারে পাছে সহজে বুঝি, তাই কি এত লীলার ছল,
বাহিরে যবে হাসির ছটা—"

চিবোনো মেয়েলী গলায় আবৃত্তি। না, ছেলেটা হিসেবে ভুল করে নি। লনের ভেতরে যে ছত্রাকার বসবার জায়গাটি আছে, সেখানে তিন-চারটি মেয়ের আসর বসেছে। অসমাপ্ত কবিতাটিকে ঢেকে দিয়ে খিল্‌খিল্ হাসির আওয়াজ ভেসে এল ওখান থেকে।

দ্বিগুণ বেড়ে উঠল ছোকরার উৎসাহ।

এইবার ব্—বল আমাকে দ্—দাও। আমি গ্—গ্—গোল দ্—দিচ্ছি—

মিস্টার চাকলাদারের সঙ্গে গিয়ে ভেড়ে না কেন? একটা অযাচিত উপদেশ দেবার আগ্রহ জাগল ওকে।

আবার ন্যাকামিভরা আবৃত্তি কানে আসছে:

"বুঝি গো আমি বুঝি গো তব ছলনা
যে কথা তুমি বলিতে চাও—সে কথা তুমি বল না—"

ছোকরাকেই শোনাচ্ছে নাকি? কে জানে—আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজী খবরে মাথা না ঘামানোই ভালো।

লাউঞ্জের দিকে পা বাড়াই। কিন্তু সেখানে বসে নরোত্তম-বাবু। আমাকে দেখে ভ্রূকুটি হানলেন।

আসুন, আসুন—বসুন।

মুখে পাকা গোঁফ, মাথায় পাকা চুল। ষাটের ওপরে বয়স। বেশ ভারী চেহারা। ব্লাড্-প্রেশারের রোগী বলে বেশি চলা-ফেরা করেন না—প্রায়ই পাজামার ওপরে একটা গাউন চাপিয়ে বসে থাকেন চুপচাপ।

আমি বসতেই কড়া গলায় জানতে চাইলেন: ওপরতলার অসিত দত্ত লোকটা কে, বলুন তো?

শুনেছি, কোথাকার জমিদার। অনেক টাকার মালিক।

টাকার মালিক! জমিদার! নরোত্তমবাবু আবার ভ্রূকুটি করলেন: আমিও এক সময়ে এস্, পি ছিলাম পুলিসে। অনেক জমিদারের ভিটেয় ঘুঘু নাচিয়েছি—জানেন?

জানতাম না, কারণ আমি জমিদার নই। সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলাম: এত চটছেন কেন?

চটব না! ডেকে আলাপ করতে গেলাম, ভালো করে একটা জবাব দিলে না পর্যন্ত! ভারী আমার ইয়ে রে! দোতলায় থাকেন! একটাকা বেশি দেবার ডাঁট্ কত!

সবাই হয়তো বেশি কথাবার্তা বলতে পারেন না। স্বল্পভাষী অনেকেই থাকেন।

রেখে দিন স্বল্পভাষী! বত্রিশটি বছর পুলিসে চাকরি করেছি—বুঝলেন? কোন্‌টা স্বভাব আর কোন্‌টা ডাঁট্ সে আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে। অমন অনেক জমিদারকে ধরে আমি ধোলাই দিয়েছি—মনে রাখবেন।

চটবেন না নরোত্তমবাবু, আপনার তো ব্লাড্ প্রেশার রয়েছে আবার।

ব্লাড্ প্রেশারের নাম শুনে নরোত্তমবাবু দমে গেলেন: চটতে

কি আর চাই—চটিয়ে ছাড়ে। সে যাক, মরুক গে। ভালো কথা—এখান থেকে টিবেটের ডিস্‌ট্যান্স কত বলুন তো?

শ-খানেক মাইল হবে বোধ হয়—সিকিম পেরিয়ে তো যেতে হয়। কিন্তু হঠাৎ তিব্বত গিয়ে কী করবেন?

ভাবছি এবার ওদিকেই ঘর-সংসার ছেড়ে পা বাড়াব, একটা মঠে-ফঠে লামা হয়ে বসব গিয়ে! আর মায়ার বন্ধন নয় মশাই। দার্জিলিঙে আসবার পর থেকেই মনটা কেমন উদাস হয়ে গেছে। ভূতপূর্ব পুলিস সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

এই গোল্‌ড স্টোনের মালাটায় আপনাকে চমৎকার মানাবে, আর আপনার আংটির জন্যে ওই ক্যাট্‌স আই।

স্তাবক-পরিবৃতা মিস্‌ রায় ফিরছেন মার্কেটিং সেরে। প্রেমিক ছোকরা বল খেলা ভুলে গিয়ে করুণ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল জুলজুল করে। তাঁর লাল শাড়ি আর লাল কোট যেন ছোকরার বুকের রক্তে রাঙানো।

নরোত্তমবাবু দাঁত বের করে ভেংচি কাটলেন: ওই এলেন! লক্ষ্মীছাড়া—বখাটে মেয়ে! আমি এখন পুলিসে থাকলে ওই মেয়েটাকে বি-এল্‌ কেসে ঠুকে দিতাম—বুঝলেন।

দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, চলি নরোত্তমবাবু, স্নান করতে হবে।

দুপুরে ডাইনিং হলে খাদ্যনীতি, রাজনীতির ব্যাখ্যা। ভিটামিনের গুণাগুণ বিচার। দার্জিলিং, সিমলা আর শিলঙের তুলনামূলক আলোচনা। মুন্নুলাল আর হনুমান দাসের ভেতর রুটি ছোড়াছুড়ি।

ঘরে এসে একটা চিঠি লেখবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই মন বসানো যাচ্ছে না। পাশের ঘরের মহিলাটি ক্রমাগত তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে চলেছেন: এই নানী, বাচ্চাকো তোয়ালে ধুয়ে দাও—গরম পানি লাও—

উঠে পেছনের বারান্দায় গেলাম, কিন্তু সেখানেও সুবিধে হল না। সেই পাঞ্জাবী মেয়ে আর মারাঠী ছোকরা। সারা দিনই এখানে আছে নাকি এরা? প্রেমের অমৃত পান করে নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেছে?

আবার ঘরে ফিরলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গেই খাতা হাতে কাঞ্চনের প্রবেশ।

দাদা, ছটো একটা কবিতা শোনাতে চাই—মুখে তার সেই আধ্যাত্মিক হাসি।

কতবার আর ব্যথা দেওয়া যায় বেচারীকে? বললাম, পড়ো, শোনা যাক।

কাঞ্চন জুত করে বসে আরম্ভ করল:

'হে হিমাদ্রি, বিচিত্র বিশাল,
তোমার রহস্য ভাবি চিত্তে মোর বিস্ময়ের জাল
ছড়ায় কুহেলি সম। মনে হয় যুগ-যুগান্তর—
স্তব্ধ তুমি, মৌন তুমি ধ্যানমগ্ন তাপস প্রবর—'

খানিকক্ষণ পরে চটকা ভাঙল কাঞ্চনের ক্ষুণ্ণ অভিযোগে।

দাদা ঘুমুচ্ছেন বুঝি? তা হলে এখন বরং থাক—

লজ্জিত বোধ করলাম: এমনি একটু ঝিম ধরেছিল, কিছু মনে করো না। তুমি পড়ে যাও।

কাঞ্চন আবার খাতা খুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই লন থেকে বিকট হৈহৈ চিৎকার উঠল। যেন ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের খেলায় গোল হয়েছে! ছ'জনেই বারান্দায় বেরুলাম।

লনে মস্ত একটা গ্রুপ্ ফোটো তোলা হচ্ছে। তুলছেন বিখ্যাত রসিক মিস্টার চাকলাদার। কী মন্ত্রে তিনিই জানেন—পান্থ-নিবাসের প্রায় সব কটি তরুণীকেই সংগ্রহ করেছেন তিনি। সকলের মাঝখানে মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়েছেন মিস্ রায়, তাঁর পরনে এখন কালো ভয়েলের শাড়ি, গায়ে কালো ওভারকোট।

কিন্তু ক্যামেরা বসানো আর ঠিক হচ্ছে না। একবার সামনে এগোচ্ছেন, আর একবার পিছিয়ে যাচ্ছেন চাকলাদার। সরস মন্তব্য চলছে সঙ্গে সঙ্গে।

এই যে মিস্ ঘোষ, আপনার মাথাটাকে কিছুতেই ম্যানেজ করতে পারছি না। দেখুন সুলতা দেবী, অমন করে হাসবেন

না। ক্যামেরাম্যান নার্ভাস হয়ে গেলে পেত্নীর মতো ফটো উঠবে আপনাদের—মনে থাকে যেন!

চারদিকে তরুণের দল সমস্বরে জয়ধ্বনি তুলছে। হনুমান দাস অকারণ পুলকে একটা ডিগ্‌বাজি খেল। পাঞ্জাবী মেয়েটি গ্রুপের মধ্যে দাঁড়ায় নি—বিষণ্ণ গম্ভীর চোখ মেলে তাকিয়ে আছে অনুষ্ঠানটার দিকে। প্রেমিক তোত্‌লা ছেলেটিও একটা ক্যামেরা কাঁধে চোরের মতো ঘুর্‌ঘুর্‌ করছে—চান্স পেলে সেও একটা ছবি নেবে!

কাঞ্চন কবিতার রসভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় একটু চটেই ছিল—তার ওপর মেজাজেও একটু পিউরিটান। বিরক্ত গলায় বললে, দেখছেন, কেমন বিশ্রী হুল্লোড় করছে!

হুল্লোড় মানে? দস্তুরমতো বেলেল্লাগিরি—পাশ থেকে নরোত্তম-বাবু বিকট কণ্ঠে বললেনঃ ছিঃ—ছিঃ—একটা ভব্যতাও তো আছে! দিনের পর দিন এসব কী হচ্ছে মশাই—চোখে দেখা যায় না যে!

কিন্তু চোখে দেখা না গেলেও দেখার লোভটা সামলাতে পারেন নি নরোত্তমবাবু। বিষাক্ত দৃষ্টিতে পুলিসী ক্রোধের জ্বালা ছড়িয়ে হয়তো ভাবছেন, এদের নামে একটা বি-এল কেস করা যায় কিনা।

চাকলাদার চেঁচিয়ে উঠলেনঃ ওয়ান—টু—উঁহু হল না! আই অ্যাম সরি মিস্ নন্দী—আপনি এক্ষুনি বেলা দেবীর পিঠে একটা চিমটি কাটলেন!

আর ও যে আমাকে—

'আয়েগা—আয়েগা আনেবালে'—মুন্নুলাল গান ধরলে আচম্‌কা।

ইউ ব্র্যাট্, শাট্ আপ্। হুংকার ছাড়লেন চাকলাদার। হাসির দমকে একেবারে বেতসকুঞ্জের মতো নুয়ে পড়লেন মেয়েরা। ছেলেদের ভেতর থেকে একটা দানবীয় কোলাহল উঠল!

ওফ্—নরোত্তমবাবু আর্তনাদ করলেন।

ব্লাডপ্রেশার আছে ভদ্রলোকের, একটা কেলেঙ্কারী না হয়ে যায়!

কাঞ্চন বললে, চলুন দাদা, ঘরে চলুন—যত সব ছ্যাব্‌লামি!

ঘরেই ফিরলাম। কাঞ্চন আবার কবিতার খাতা খুলল:

'কালকে রাতে ঘুম-পাহাড়ের হাজার তারা—
হিমের আড়ে ঘুমিয়ে গেল আপন হারা।
আমি কবি, একলা বসে বাতায়নে—'

কিন্তু এবারেও সুর কাটল।

আর-একটা প্রচণ্ড কোলাহল। একবারের জন্যে ভেসে উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেল আকস্মিকভাবে। একটা মৃত্যুর গভীরতায় তলিয়ে গেল পান্থ-নিবাস।

আবার বেরিয়ে এলাম।

লনের সমস্ত মানুষগুলো যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে। ক্যামেরা হাতে রসিক চাকলাদার বোকার মতো দাঁড়িয়ে। মেয়েরা দল ভেঙে নিঃশব্দে সরে যাচ্ছে এদিকে ওদিকে। হনুমান দাস আর মুন্নুলাল গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সভয়ে। পাঞ্জাবী মেয়েটির দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। যারা এতক্ষণ কোলাহলে চারদিক কাঁপিয়ে তুলছিল—তারা কথা কইছে নিঃশব্দ সন্ত্রস্ত কণ্ঠে। প্রেমিক ছেলেটি যেন পালাবার পথ খুঁজছে। ওপর তলার অসিত দত্ত কখন নরোত্তম-বাবুর কাছে নেমে এসে পাশাপাশি নিথর হয়ে গেছেন।

পাশের ঘরের নেপালী 'নানী' নিজের সাত মাসের বাচ্চা ফেলে দৈনিক একটা টাকার লোভে পরের ছেলের ভার নিতে এসেছিল। গরীব মা তার লোভের শাস্তি পেয়েছে। এই মাত্র খবর এল, পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে মারা গেছে তার সাত মাসের বাচ্চাটা।

আকাশে একখানা কালো মেঘ উঠছে—পান্থ-নিবাসের সব কিছু বেসুরো হয়ে গেছে মুহূর্তের মধ্যে। কিন্তু একটু পরেই মেঘ কেটে গেলে—রোদে ঝল্‌মল্‌ করে উঠবে সাড়ে ছ-হাজার ফিটেরও অনেক—অনেক ওপরে শহর দার্জিলিং। সেই ফাঁকে ক্যামেরাটা আর একবার লোড করে নিন মিস্টার চাকলাদার, আর একবার শাড়ি আর কোট বদলে নিতে পারেন মিস্‌ রায়।

পাবলিক লাইব্রেরি থেকে আনা, 'পাতা মুড়িবেন না' ছাপ মারা এবং পাতায় পাতায় মোড়া জীর্ণ বাংলা উপন্যাসখানা পড়বার চেষ্টা করছিল সিতাংশু। রাত এগারটার কাছাকাছি, অসহ্য গরম। জানলা দিয়ে বাতাস আসছিল না, তা নয়, কিন্তু তাতে আগুনের ছোঁয়া। দিনে দুর্দান্ত গরম থাকলেও সন্ধ্যার পরেই নাকি সাঁওতাল পরগনার সুশীতল বাতাস বইতে থাকে, এমনি একটা জনশ্রুতি তার শোনা ছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, রাত তিনটের আগে সেই বিখ্যাত 'শীতল হাওয়াটি' প্রবাহিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

বইটি প্রেমের উপন্যাস এবং শুরু হয়েছে পাইন বনের ভিতরে একটি আঁকাবাঁকা পথের উপর; কুয়াশা কেটে গিয়ে পাইনের ঊর্ধ্বমুখী কণ্টকপত্রে সোনালী রোদ পড়েছে—দু'ধারে বরাশ ফুল ফুটেছে রাশি রাশি, আর ওভারকোটের পকেটে হাত দিয়ে একটি মেয়ে আশ্চর্য গভীর চোখ মেলে দূরের নীল পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক সেই সময়—

ঠিক সেই সময়েই বিরক্ত হয়ে সিতাংশু পর পর কয়েকটা পাতা উল্টে গেল। এই দুর্ধর্ষ গরম, ইলেক্‌ট্রিকবিহীন এই বাড়ি, নিঃসঙ্গ এই জীবন—এর ভিতরে শীতল পাহাড়ের কবোষ্ণ রোমান্স তার কল্পকামনা অনেকটা মেটাতে পারত; কিন্তু সিতাংশুর প্রতিক্রিয়া অন্যরকম হল। কেন এমন বাজে বই লেখা হয়, কেই বা সেটা ছাপে এবং যদিই বা সেটা ছাপা হয়, তা হলে পাতাগুলো দিয়ে মুড়ির ঠোঙা তৈরি না করে পাঠককে যন্ত্রণা দেবার জন্যে লাইব্রেরিতে রাখা হয় কেন, এই ধরনের গোটাকয়েক আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা তার মনের ভিতর ঘুরপাক খেয়ে গেল।

কিন্তু লাইব্রেরির বইয়ের আরও একটা আকর্ষণ আছে। সে

হল অনাহুত টীকাকারদের মন্তব্য। বাঁধাইয়ের দু'ধারের শাদা পাতায়, বইয়ের মার্জিনে রসিক পাঠকদের নানা রকম স্বতোৎসারিত উচ্ছ্বাস। যেমন: 'বাঃ, বেশ বেশ—একেই বলে খাঁটি প্রেম', 'একসেলেন্ট' কিংবা 'মণিকার এইরূপে চিন্তা করা অন্যায়। হিন্দু নারী হইয়া সে পরপুরুষের' ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া কাঁচা হাতের কিছু কিছু অশ্লীল মন্তব্যও থাকে। আর বই যদি পাঠকের ভালো না লাগে, তা হলে লেখকের উদ্দেশে যে-সব মন্তব্য বর্ষণ করা হয়, ভদ্রলোক সেগুলো জানতে পারেন না বলেই আত্মহত্যা করেন না।

অতএব সিতাংশুও কালিদাস ছেড়ে মল্লিনাথ পড়া শুরু করল। একটি নয়—অন্তত পেন্সিলে আর কালির লেখা গুটিসাতেক মল্লিনাথের সন্ধান পাওয়া গেল। কাছাকাছি কোনও হ্যাণ্ড রাইটিং এক্সপার্ট থাকলে সঠিক সংখ্যাটা বলতে পারতেন।

কিন্তু তাই বা ভালো লাগে কতক্ষণ। গরম—কদর্য গরম। হাওয়াটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জানলার বাইরে কালো ব্রোকেডের পর্দার মতো টানা অন্ধকার—তার ভিতর দিয়ে দু-তিনটে ইউক্যালিপটাসের বাকলহীন শুভ্রতা অতিকায় কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে। মিউনিসিপ্যালিটির একটা কেরোসিনের আলো জানলার প্রায় মুখোমুখি ছিল, সেটা সন্ধ্যে না লাগতেই নিবে গিয়েছে। ঘরের দেওয়ালে লণ্ঠনের আলোয় নিজের যে ছায়াটা পড়েছে—সেটাকে পর্যন্ত সিতাংশুর অসহ্য বোধ হতে লাগল। ওটা যেন তার মনের ছায়া—বিকৃত, অর্থহীন, অশোভন, অশালীন; বাইরের অন্ধকারে গিয়ে ওটা দাঁড়ালেই ভালো হত—তার প্রত্যেকটা অঙ্গভঙ্গিকে এমনভাবে ক্যারিকেচার করবার প্রয়োজন ছিল না।

ঘাম ঝরছে না—সারা শরীর যেন জ্বালা করছে। একবার স্নান করতে পারলে ভালো হত। কিন্তু—

ঠিক নাটকীয়ভাবে সেই সময় শব্দটা শুনল সিতাংশু। পরিষ্কার শুনতে পেল। ইঁদারার গায়ে-দড়ি ঘষার খস্‌খস্ আওয়াজ, বাঁশের একটা মৃদু গোঙানি আর ছলাত ছলাত করে জলের কলধ্বনি।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল সিতাংশু। লণ্ঠনটা কমিয়ে দিয়ে পা টিপে টিপে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। তার পর কপাটটা ইঞ্চি তিনেক ফাঁক করে তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে দিলে সামনের দিকে।

বাড়ি যতই ছোট হক—তারের বেড়া ঘেরা কম্পাউণ্ডটা অনেকখানি। সিতাংশুর ঘর থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে তার ইঁদারা। এই অন্ধকারে একটা ঝাঁকড়া পিপুল গাছ আরও অন্ধকার ছড়িয়েছে তার উপর। তবু স্পষ্ট দেখলে সিতাংশু। কে একজন ইঁদারা থেকে জল তুলছে—বালতি উপরে টানার সঙ্গে সঙ্গে তার নুয়ে-পড়া শরীরটা সোজা হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে।

হিংস্র ক্রোধে দাঁতে দাঁত চাপল সিতাংশু। এই ব্যাপার। এই জন্যেই অতখানি টলটলে জল দু' দিনের ভিতরেই বালিতে ভরে উঠছে! সন্দেহ একটু ছিলই—এইবার বোঝা গেল সব। জল চুরি হচ্ছে।

একটা বিশ্রী উপন্যাস। কুৎসিত গরম। নিঃসঙ্গ নির্বাসিতের মতো জীবন। ইলেক্‌ট্রিকের আলোহীন ঘরে নিজের ছায়ার ভ্যাংচানি। তার উপর চুরি? সিতাংশুর মাথায় আগুন জ্বলল।

দরজা বন্ধ করে সে ঘরে ফিরে এল। কী করা যায়? তাড়া করলে তারের বেড়া ডিঙিয়ে পালাবে।—ধরা যাবে না। অসম্ভব আশায় চারদিকে একবার সে তাকিয়ে দেখল—কোনও মির্যাক্‌লে একটা বন্দুক যদি এই মুহূর্তে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাহলে আর ভাবনার কিছু থাকে না। কিন্তু বন্দুকের বদলে পাওয়া গেল একটা মশারির স্ট্যাণ্ড।

আর দেরি করা যায় না। জলের বালতি নিয়ে একবার তারের বেড়া টপকে চলে গেলে আইনত সিতাংশুর আর কিছুই বলবার নেই। সুতরাং যা করতে হয়—এক্ষুনি।

মশারির স্ট্যাণ্ডটা শক্ত করে ধরে পিছন দিয়ে ঘুরে সিতাংশু ইঁদারার দিকে এগোতে চেষ্টা করল। চোর তখন নিবিষ্টচিত্তে জল তুলছে। জলের ছলাত ছলাত আওয়াজ সিতাংশুর জ্বালাধরা

রোমকূপগুলোকে পুড়িয়ে দিতে লাগল। তার পর যখন আর এগনো চলে না—যখন প্রায় দশ-বার গজের মধ্যে এসে পড়েছে যখন আর এক পা বাড়ালেই চোর তাকে দেখতে পাবে, তখন হাতের ডাণ্ডাটা সে ছুড়ে মারল সবেগে।

নির্ভুল লক্ষ্যভেদ! একটা মৃদু আর্তনাদ করে চোর মাটিতে ঘুরে পড়ল।

কিন্তু সিতাংশুর হাত-পা জমে গিয়েছে তৎক্ষণাৎ। গরম, বিরক্তি আর ক্রোধে অতখানি অন্ধ না হলে আরও আগেই সে বুঝতে পারত। একটি মেয়ে।

কী সর্বনাশ! রোম্যান্টিক উপন্যাসের পাতা থেকে একেবারে নারীহত্যায়!

কে বলে, পশ্চিমের গরমে ঘাম হয় না? মুহূর্তে ঘেমে উঠল সিতাংশু, ভিজে গেল গেঞ্জি, জিভটা চলে যেতে চাইল গলার ভিতর, মাথাটা একেবারে ফাঁপা হয়ে গেল। এইবার?

মেয়েটা নড়ে উঠল। উঠে বসতে চেষ্টা করছে। যাক—একেবারে খুন হয় নি তা হলে, বেঁচে আছে এখনও! সন্তর্পণে কাছে এগোল সিতাংশু।

এক টুকরো চাঁদ উঁকি দিয়েছে আকাশে। পিপুল গাছের পাতার ভিতর দিয়ে ম্লান খানিকটা আলো এসে পড়েছে মেয়েটির মুখে। চিনতে পেরেছে সিতাংশু। পিছনের বাড়িতে পোস্ট অফিসের যে নতুন ভদ্রলোকটি এসেছেন—তাঁরই কেউ হবে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয় নি—কিন্তু মেয়েটিকে কয়েকদিনই চোখে পড়েছে।

সিতাংশু সামনে আসতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। চাঁদের আলোতেও দেখা গেল, তার কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছে। আর সেই সঙ্গে শোনা গেল ফোঁপানো কান্নার স্বর: এক বাল্‌তি জল নিতে এসেছিলুম আপনার ইঁদারা থেকে, সেজন্যে এমন করে আমায় মারলেন!

আগেই মরমে মরে গিয়েছিল সিতাংশু, এবার মিশে গেল মাটিতে।

আমায় ক্ষমা করবেন। মানে, আমি ভেবেছিলুম—

কী ভেবেছিলেন ?—কান্নার ভিতর থেকে এবার ঝাঁঝ বেরিয়ে এল, কোনও পুরুষ-মানুষ ? যেই হোক্ না—এক ফোঁটা জলের জন্যে তাকে আপনি খুন করতে চাইবেন ? আপনি না ভদ্রলোক ?

গলার স্বরে বোঝা যাচ্ছে, ব্যাপারটা খুব গুরুতর হয় নি। ভরসা পেয়ে রাগ হল সিতাংশুর। এক ফোঁটা জলই বটে। এদিক্‌কার সমস্ত ইঁদারাই প্রায় শুকিয়ে মরুভূমি—সিকি মাইল রাস্তা পেরিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির একটা টিউবওয়েল ভরসা। তার ইঁদারায় যে দু-চার বালতি জল আছে, তা-ও এ-ভাবে লুট হতে থাকলে মাথায় খুন চাপা অন্যায় নয়।

কিন্তু সে-কথা বলল না সিতাংশু।

এসে চাইলেই পারতেন।

চাইলেই যেন দিতেন আপনি।

স্পষ্ট পরিষ্কার কথা। না—দিত না সিতাংশু। এই দুঃসময়ে অতখানি উদারতা তার নেই, কোনও মহিলা সম্পর্কেও না। বিব্রত হয়ে সিতাংশু বললে, থাক ও-সব কথা। আপনার কপালটা কেটে গিয়েছে মনে হচ্ছে। দাঁড়ান, আয়োডিন এনে দিচ্ছি।

খুব হয়েছে, আর উপকার করতে হবে না। কপাল ফাটিয়ে দিয়ে জলের দাম তো আদায় করলেন। কী করব এখন ? জলটা নিয়ে যাব ; না আবার ঢেলে দেব ইঁদারায় ?

সিতাংশু অপ্রস্তুত হল। আশ্চর্যও হল সেই সঙ্গে। একটুও আত্মসম্মান নেই মেয়েটার—এত কাণ্ডের পরেও ভুলতে পারে নি জলের কথাটা !

ছি, ছি, কী যে বলেন ! চলুন, আমিই পৌঁছে দিয়ে আসছি জলটা—

কোথা থেকে এসে পড়ল টর্চের আলো। চমকে তাকাল দু'জনেই।

পোস্ট অফিসের সেই ভদ্রলোক। পিছনের বাড়ির নতুন ভাড়াটে।

কী হয়েছে বুলু ?—টর্চের আলোয় বুলুর কপালের রক্ত একরাশ সিঁদুরের মতো ঝকঝক করে উঠল : কী করেছিস আবার ?

সিতাংশু পাথর হয়ে গেল। আর বুলুই জবাব দিলে।

অন্ধকারে ইঁদারার ওপর পড়ে গিয়েছিলুম কাকা। ইনি ছুটে এসে—

তারের বেড়া টপকে ভিতরে এলেন ভদ্রলোক।

তোকে হাজারবার বারণ করলুম, এত রাতে জলের দরকার নেই, তবু হতভাগা মেয়ের কানে গেল না। তোর জন্যে শেষে একটা কেলেঙ্কারিতে পড়ব এ আমি ঠিক জানি। নে চল্—বালতি তুলে নিয়ে ভদ্রলোক সিতাংশুর দিকে তাকালেন : কিছু মনে করবেন না মশাই, এই মেয়েটার জ্বালায় আমার একদণ্ড স্বস্তি নেই। কপালে যে আমার কত দুঃখ আছে সে কেবল আমিই জানি। আপনার ঘুম নষ্ট হল, অপরাধ নেবেন না।

সিতাংশু কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুযোগ পেল না। বিহ্বলতার ঘোর কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই কাকা-ভাইঝি তারের বেড়া পার হয়ে চলে গিয়েছেন। ফিকে চাঁদের আলোয় দুটো অবাস্তব ছায়ামূর্তি।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে নিচু হয়ে মশারির স্ট্যাণ্ডটা তুলে নিলে সিতাংশু। এটা কি চোখে পড়ে নি ভদ্রলোকের ? না-পড়া অসম্ভব। অসহ্য গরম নিঃসঙ্গ ঘরটার দিকে যেতে যেতে সিতাংশু নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে চাইল, কে ভালো অভিনয় করেছে ? বুলু, না তার কাকা ?

সারাটা রাত আর ভালো করে ঘুম এল না, কাটল অস্বস্তি-ভরা তন্দ্রার ভিতর। চোখ কচলাতে কচলাতে সিতাংশু যখন বারান্দায় এসে দাঁড়ালো, তখন তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল রোদে চারদিক ভরে উঠেছিল। রাস্তার ওপারে ইউক্যালিপ্‌টাসের সারি পেরিয়ে কাঁকর-

মেশানো ঢেউ-খেলানো মাঠ—তার ভিতরে একটা খাপছাড়া শাদা বাড়ি রোদে জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে। দূরের রুক্ষ পাহাড়টা পড়ে আছে অপরিচ্ছন্ন বন্য মহিষের মতো—তার পত্রহীন গাছপালা আর বড় বড় ন্যাড়া পাথর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকেও।

সব শ্রীহীন—সবকিছু আগুন দিয়ে ঝলসানো। মেঘনা-পারের সিতাংশু বিরস বিতৃষ্ণ মুখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার পর মনে পড়ল, একদিনের ছুটি নিয়ে তার ছোকরা চাকর ধনিয়া নিজের 'গাঁওমে' গিয়েছিল—আজ চতুর্থ দিনেও সে ফেরে নি। গ্রামে যাওয়া খুবসম্ভব বাজে কথা—বেশি মাইনেতে আর কোথাও কাজে লেগেছে। ওর দোষ নেই। ভদ্রলোকেই যদি জল চুরি করতে পারে—

মেঘনা-পারের সিতাংশু সেনগুপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সাহারা মরুভূমি নয়—বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে একশো মাইলের মধ্যেই যে জল চুরি করবার দরকার হয়, মেঘনার কালো অথই জলের দিকে তাকিয়ে সে কথা কে ভাবতে পারত!

কিন্তু ও-সব তত্ত্বচিন্তা এখন থাক। আপাতত সিতাংশুকে নিজের হাতে চা করতে হবে, রান্নার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। তবু তো আজ বাজারে যাওয়ার সমস্যা নেই—কাল অফিস থেকে ফেরবার সময় বুদ্ধি করে আলু আর ডিম নিয়ে এসেছিল। নাঃ, আর দেরি করা চলে না।

মুখ ধুতে ইঁদারার পাড়ে আসতেই চোখে পড়ল। তিন চার ফোঁটা রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে আছে। আত্মগ্লানিতে সিতাংশু সেদিকে আর তাকাতে পারল না। মেয়েটিকে একবার একা পাওয়া দরকার, ভালো করে ক্ষমা চাইতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় যাবে নাকি ও-বাড়িতে? কিন্তু আলাপ পরিচয়টাই যখন হয়ে ওঠে নি এ পর্যন্ত, তখন—

অন্যমনস্কভাবে ইঁদারায় বালতি নামিয়েছিল, অন্যমনস্ক হয়েই টেনে তুলল। আর তৎক্ষণাৎ সমস্ত অনুতাপ মুছে গেল—পা থেকে জ্বলে উঠল মাথা পর্যন্ত। অর্ধেক জল, অর্ধেক বালি।

আরও অর্ধেক শুকিয়ে গিয়েছে ইঁদারা, কাল ওভাবে চুরি না হলে আজকের দিনটা কুলিয়ে যেত। চাকরটা থাকলেও বা কথা ছিল, এখন তাকেই গিয়ে সিকি মাইল দূরের টিউবওয়েল থেকে জল আনতে হবে। আর যা ভিড় সেখানে!

ছুত্তোর!

কুঁজোর জলে চা খাওয়া কোনোরকমে চলতে পারে। স্নানের আশা নেই। অফিস যাওয়ার পথে খাওয়ার জন্যে ঢুকতে হবে হোটেলে। সিতাংশুর মনে হতে লাগল, মশারির স্ট্যাণ্ড দিয়ে ঘা কয়েক ওই ভদ্রলোককেই বসিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। সবই জানতেন—অথচ কেমন ন্যাকামি করে গেলেন। আর মেয়েটা —সেই বুলু! অবশ্য রক্তপাত না হলেই খুশি হত সিতাংশু; কিন্তু ডাণ্ডার ঘা তার যে একেবারেই পাওনা ছিল না, এই মুহূর্তে সে তা ভাবতে পারল না।

অফিস থেকে বেরিয়ে, রাস্তায় চা খেয়ে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আবার সেই ঘর, সেই গরম, লণ্ঠনের আলোয় নিজের কদাকার ছায়া আর সেই বাংলা উপন্যাসটা। লণ্ঠনটা জ্বালাতে জ্বালাতে সিতাংশুর মনে হল, তার পর আরও অনেক রাতে ইঁদারার থেকে আবার কেউ হয়ত জল চুরি করতে আসবে, যদিও আজ বালতি ভরে বালিই উঠবে কেবল। কিন্তু কে আসবে? বুলু? না—বুলু আর আসবে না।

যদি বুলুই আসে? একটা অসম্ভব কল্পনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সিতাংশু। তা হলে আজ কী করবে সিতাংশু? দূর থেকে দেখা, পিপুল-পাতায় জ্যোৎস্নায় আধখানা দেখা আর একটি ছোট টর্চের আলো এক ঝলক দেখা বুলুর মুখের সামনে আজ লণ্ঠনটা তুলে ধরবে সে। দেখবে, কাল রাতে কতখানি ক্ষত সে মেয়েটির কপালে এঁকে দিতে পেয়েছে—কতটা লিখে দিতে পেরেছে নিজের স্বাক্ষর।

আসতে পারি?

বুলু নয়—তার কাকা। সেই অনেক রাতের প্রত্যাশিত সময়টির অনেক আগেই এসে পড়েছেন তিনি।

সিতাংশু চমকে মাথা তুলে বললে, আসুন।

বুলুকে লণ্ঠনের আলোয় দেখতে চেয়েছিল সিতাংশু, দেখল তার কাকাকে। বছর পঁয়তাল্লিশেক বয়স হবে। শক্ত ভারী গোছের বেঁটে মানুষ। কপাল থেকে মাথার আধখানা পর্যন্ত মসৃণ টাক। সিতাংশুর জারুল কাঠের চেয়ারটায় সশব্দে আসন নিলেন।

আলাপ করতে এলুম। আমার নাম বিরাজমোহন মল্লিক। আপনি?

সিতাংশু সেনগুপ্ত।

দেশ?

সিতাংশুকে বলতে হল।

তাই বলুন—আমাদের ইস্ট বেঙ্গলের লোক। চেহারা দেখে আমারও তাই মনে হয়েছিল।

পূর্ববঙ্গত্ব এমনভাবে তার শরীরে লেখা আছে, এ-খবরটা এতদিন সিতাংশুর জানা ছিল না। মৃদু রেখায় হাসল সে।

তা একা আছেন এখানে? ফ্যামিলি কোথায়?

মা-বাবা কলকাতায় থাকেন।

ওয়াইফ?

বাঙালির স্ত্রীকে বাংলা ভাষায় ওয়াইফ বললে ভারী কুশ্রী শোনায় সিতাংশুর কানে। তবু এবারেও সে অল্প একটু হাসল। বললে, তাঁকে এখনও জোটাতে পারি নি।

বলেন কী, ব্যাচেলার!—বিরাজবাবু বিস্মিত হলেন: তিরিশ তো পেরিয়ে গেছেন বোধ হয়।

হ্যাঁ, বছর দুই হল।

তবু এখনও বিয়ে করেন নি! বুড়ো বয়সে যে ছেলের রোজগার খেয়ে যেতে পারবেন না!

সেই ছুশ্চিন্তায় সিতাংশুর রাতে ঘুম হচ্ছিল না। তবু এবারে ভদ্রতার হাসি হাসতে হল।

বাবা-মা-ই বা কী বলে চুপ করে আছেন। বিরাজবাবু স্বগতোক্তি করলেন, বিমর্যভাবে চুপ করে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড। তার পর এলেন অন্য প্রসঙ্গে :

কিন্তু এই জলের কষ্ট তো আর সহ্য হয় না মশাই। মরুভূমিতে এলুম নাকি ?

সেইরকমই তো মনে হচ্ছে।

মিউনিসিপ্যালিটিতে কড়া করে একখানা দরখাস্ত দিলে কেমন হয় ?

আসছে বছর গ্রীষ্মকালে সে-দরখাস্ত নিয়ে ওঁরা আলোচনা করবেন।

যা বলেছেন ! সক্ষোভে বিরাজবাবু মাথা নাড়লেন : স্বাধীনতার পরেও এরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল। এ-দেশের উন্নতি হতে মশাই আরও পাঁচ শো বছর।

তার পর আধঘণ্টার মতো নির্বাক শ্রোতার ভূমিকায় নিঃশব্দে বসে রইল সিতাংশু। এ-সব ক্ষেত্রে সাধারণত যা যা বলবার থাকে, বিরাজবাবু কিছুই তার বাদ দিলেন না। গোটা তিনেক সিগারেট খেলেন এবং সামনে অ্যাশ্-ট্রে থাকতেও ছাই ঝাড়লেন মেঝের উপর। আর সিতাংশু কালকের মতো নিজের ছায়া দেখতে লাগল লণ্ঠনের আলোয়, কান পেতে শুনতে লাগল বাইরে মাঠের ভিতর দিয়ে হুহু করে বয়ে যাচ্ছে হাওয়া, আর ইউক্যালিপ্‌টাসের পাতাগুলো ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে তাতে।

শেষ পর্যন্ত বিরাজবাবু উঠলেন।

একটা লোকই তা হলে রাখা যাক, কী বলেন ? ছু-বেলা টিউবওয়েল থেকে আমাদের ছু-বাসায় জল দেবে। টাকাটা দেওয়া যাবে ভাগাভাগি করে।

সে তো বেশ কথা !

দেখি তবে চেষ্টা করে—দরজার দিকে পা বাড়িয়েছেন বিরাজ-বাবু, সেই মুহূর্তেই প্রায় মুখ ফস্‌কে প্রশ্নটা বেরিয়ে এল সিতাংশুর।

আপনার ভাইঝি কাল পড়ে গিয়েছিলেন—কেমন আছেন আজ?

অদ্ভুত দৃষ্টিতে বিরাজবাবু সিতাংশুর দিকে তাকালেন। লণ্ঠনের আলোয় মেক-আপ করা অভিনেতার মতো দেখাল তাঁকে।

কে, বুলু? বুলু ঠিক আছে। সাংঘাতিক মেয়ে মশাই—অল্পে ওর কিছু হয় না। মাটিতে পুঁতে দিলে কাঁটাগাছ হয়ে বেরুবে।

বিরাজবাবু বেরিয়ে গেলেন।

আজও রাত বারোটা পর্যন্ত একা ঘরে ছটফট করল সিতাংশু, সেই বাংলা উপন্যাসখানার পাতা ওল্‌টাল, রসিক পাঠকদের টীকা-টিপ্পনীগুলো পড়বার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আজ আর অক্ষম বিরক্তিতে নয়—সেই অসম্ভব দুরাশায় সে কান পেতে বসে রইল। কয়েকবার উঠে গেল জ্যোৎস্নার জাফ্‌রিকাটা পিপুল গাছটার তলায়। বুলু আজ আর আসবে না সে জানে, তবু এই রাত, এই গরম—আর উত্তেজিত স্নায়ুর একটা বিচিত্র কুহকে সিতাংশু রাত আড়াইটে পর্যন্ত প্রতীক্ষায় জেগে রইল। তার পর বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে এল, ক্লান্ত অবসাদে ঝিমিয়ে এল শরীর, আর ঘুমের ঘোরে সিতাংশু স্বপ্ন দেখল, মেঘনার কালো জলের উপর দিয়ে গেরিমাটির বন্যা ছুটে চলেছে।

বুলু এল না।

সে রাতে নয়, তার পরের রাতে নয়, তার পরের রাতেও নয়। সিতাংশু কেমন একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণায় পীড়িত হতে লাগল। আশ্চর্যভাবে লুকিয়ে গিয়েছে মেয়েটা। যখন তাকে দেখার কোনও কৌতূহল ছিল না, তখন কতবার পিছনের বাড়ির বারান্দায়—খোলা জমিটুকুতে কতভাবে তাকে সে দেখেছে। সেদিন সে বুলুকে মনে রাখতে চেষ্টা করে নি—দরকারও ছিল না। সেই আধ-খানা

দেখা, ঝিলিমিলি জ্যোৎস্নায় একটুকরো দেখা আর বিরাজবাবুর টর্চের আলোয় রক্তের সিঁদুর-মাখানো একটুখানি শুভ্র ললাট, এর বেশি আর কিছু মনে আনতে পারে না সিতাংশু। সে শুধু একবার দিনের আলোয় দেখতে চায় বুলুকে—দেখতে চায় তার কপালে—

দেখা হয় বিরাজবাবুর সঙ্গে। বাজারে, অফিসের পথে।

জল পাচ্ছেন ঠিকমতো ?

পাচ্ছি।

জষ্ঠি মাস পার হয়ে গেল মশাই, এখনও বৃষ্টি নেই এক ফোঁটা। কী করা যায় বলুন তো।

কী আর করা যেতে পারে। আকাশের উদ্দেশে বৃষ্টির জন্যে একখানা দরখাস্ত লেখা যেতে পারে—এমনি একটা জবাব আসে ঠোঁটের কোনায়। কিন্তু বিরাজবাবুকে সত্যিই ও-কথা বলা যায় না।

আর জিজ্ঞাসা করা যায় না বুলুর কথা। খবরের কাগজ চাইবার কিংবা বাড়িতে ডিক্সনারি আছে কিনা জানবার যে-কোনও একটা উপলক্ষ নিয়ে বিরাজবাবুর বাসায় একবার যে যাওয়া যায় না তা-ও নয়। কিন্তু কিছুতেই পেরে ওঠে না সিতাংশু। নিজের এই ছেলেমানুষি কৌতূহলের উগ্রতা তাকে যত বেশি পীড়ন করে, ততখানিই লজ্জা দেয়।

কেন যে বুলুর ক্ষতচিহ্নিত কপালটাকে একবার দেখবার জন্যে এই পাগলামি তাকে পেয়ে বসেছে, সিতাংশু নিজের কাছেই তার কোনও কৈফিয়ত খুঁজে পায় না। বুলুর কাছে ক্ষমা চাইবে একবার ? বলবে, আমাকে যত বড় পাষণ্ড ভেবেছেন আমি তা নই ? কোনও মেয়ের গায়ে হাত তোলা দূরে থাক, ছেলেবেলার সীমা পার হয়ে নিজের ছোট-ভাইকে পর্যন্ত কোনদিন একটা চড়-চাপড়ও মারি নি ? আর বুলুর কপালের দিকে তাকিয়ে নিজের অপরাধের সে পরিমাপ করতে চায়, জেনে নিতে চায়, কোনও বড় ক্ষতি সে করে নি, ছোট্ট একটুখানি দাগ, দুদিন পরেই মিলিয়ে যাবে ?

ঠিক কী বলতে চায় সিতাংশু জানে না। কেবল অর্থহীন মনোযন্ত্রণার পীড়ন। ভূতের মতো ভাবনাটা তার উপর চেপে বসেছে, নিজেকে কিছুতেই ছাড়াতে পারে না তার হাত থেকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুলুও এল।

আজও ঠিক তেমনি উত্তপ্ত সন্ধ্যা। লণ্ঠনের আলোয় নিজের বিকৃত ছায়া দেখতে দেখতে খেপে গিয়ে সিতাংশু বাতিটা নিবিয়ে দিয়েছিল। তার পর ইজিচেয়ার পেতে চুপ করে বসে ছিল জানলার কাছে—বাইরে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে ছিল বল্কলবিহীন ইউক্যালিপটাসের সারি—যেন কোন নিবন্ত চিতা থেকে উঠে আসা বাতাস ঝরঝরিয়ে তাদের পাতা ঝরাচ্ছিল।

আসব?

দরজার ফ্রেমে একটি মেয়ের ছায়াশরীর। সিতাংশুর সমস্ত সত্তা একটা নিঃশব্দ চিৎকারে ভরে উঠল। বুলু! বুলু ছাড়া আর কেউ নয়—কেউ হতেই পারে না। তবু জিজ্ঞাসা করলে, কে?

আমি বুলু। একটা চাপা হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল, আপনার জল চুরি করতে এসেছিলুম।

আর লজ্জা দেবেন না। উদগ্র আহ্বানে সিতাংশুর শিরাগুলো টান-টান হয়ে উঠল, বসুন, আলোটা জ্বালি।

আলো জ্বালবার দরকার নেই—খামকা রাস্তার লোকের চোখে পড়বে। শুধু একটা কথা বলতে এলুম। বলেই চলে যাব।

চেষ্টা করেও সিতাংশু গলার কাঁপন থামাতে পারল না। বললে, কিন্তু আপনাকে আমারও বলবার কিছু আছে। সেদিন যে অন্যায় আমি করে ফেলেছি—

অন্যায় আপনি করেন নি। আমার যা পাওনা তাইই পেয়েছি। আমি সত্যি সত্যিই চোর।

ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন। আবছা অন্ধকারেও হাত জোড় করল সিতাংশুঃ আপনি জানেন না, আমি যে সেই থেকে কী লজ্জায়—

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো ছায়ারূপিণী বুলু। যেন অনেক দূর থেকে, অথচ স্পষ্ট সুরেলা গলায় বললে, আগে আমার কয়েকটা কথা শুনুন—তার পরে লজ্জা পাবেন। আমি আজ আপনার কাছে কেন এসেছি জানেন? আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়ে যে দুঃখ আপনি পেয়েছেন, সেই দুঃখ থেকে আপনাকে মুক্তি দেব বলে। তাছাড়া কাল আমি চলে যাব এখান থেকে—যাওয়ার আগে আপনাকে সামনে রেখে নিজের কথাগুলো বলে যাব। ইচ্ছে হলে শুনতে পারেন, না-ও শুনতে পারেন। আস্তে আস্তে এগিয়ে টেবিলের পাশটিতে বসে পড়ল বুলু।

আর কেমন থমকে গেল সিতাংশু, মুহূর্তে বুলু যেন তাকে অনেকখানি দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। বিহ্বলভাবে বললে, আপনি যে কী বলছেন, আমি—

এখুনি বুঝতে পারবেন। আপনার ইঁদারা থেকে দু' বালতি জল নিতে এসেছিলুম, সেটা বড় কথা নয়। শুনুন, আমি চোর হয়েই জন্মেছি। হাতের সামনে কোনও জিনিস দেখলে আমি আর লোভ সামলাতে পারি না। সে টাকা হোক, পেন্সিল হোক, একটা ফুলই হোক। ছেলেবেলা থেকে পাড়ার কোনও মেয়ে আমার সঙ্গে খেলত না—কোনও বাড়িতে ঢুকলেই আমাকে তারা তাড়িয়ে দিত। মেয়েদের বই খাতা চুরির জন্যে ইস্কুল থেকে বার বার আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছে—শেষে অসহ্য হয়ে বিদায় করেছে। আমার দু' বছর বয়েসে মা মারা যান—দেবীর মতো পবিত্র ছিলেন তিনি। বাবা ছিলেন স্কুলের হেড্‌মাস্টার—সারা জীবন সততারই সাধনা করেছেন। অথচ আমি—

বুলু থামল, কান্নায় ভারী হয়ে উঠছে গলা। সান্ত্বনা দেওয়া উচিত ছিল সিতাংশুর, ভাষা খুঁজে পেল না।

বুলু বলে চলল, দশ বছর বয়সে বাবা আমায় ছেড়ে গেলেন, এলুম কাকার কাছে। কাকা আমার স্বভাব বদলাবার অনেক চেষ্টা করেছেন, চাবুক দিয়ে মেরেছেন, সারা পিঠে আমার

দাগ পড়ে গিয়েছে, অথচ কিছুতেই আমি পারি না। না খেতে দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখেছেন, বেরিয়েই আমি তখুনি ফিরিওলার ঝুড়ি থেকে কমলালেবু চুরি করেছি।

সিতাংশু একটা অস্ফুট আর্তনাদ করল। বুলু উঠে দাঁড়ালো—সরে গিয়ে সিলুয়েত্‌ ছবির মতো ঠাঁই নিলে দরজার ফ্রেমে।

ভয় পাচ্ছেন, না? কান্না-মেশানো হাসির আওয়াজ এল বুলুর, সত্যি ভয় আপনি পেতে পারেন। আমি এক্ষুনি আপনার টেবিল থেকে ঘড়ি কিংবা কলম যা হোক একটা তুলে নিতে পারি। হাত আমার এমনি রপ্ত হয়ে গেছে যে, আপনি টেরও পাবেন না।

নার্ভাসভাবে গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিলে সিতাংশু। ছেলেমানুষের মতো বললে, কিন্তু আমি তবুও—কিছুতেই—

বিশ্বাস করতে পারেন না—না? অনেকেই পারে না। ভালো করে আমাকে যদি দেখেন আপনি, স্বীকার করবেন আমি সুন্দরী। রূপটা আমার গুড্‌ কণ্ডাক্টের সার্টিফিকেট। কিন্তু আমাকে যারা চিনেছে, তারা কখনও ভুল করবে না।

সিতাংশু আবার গলাটা পরিষ্কার করে নিলে। কিন্তু এবার আর কথা বেরুল না মুখ দিয়ে।

বুলু বলে চলল, আমি জানি—এ আমার রোগ। কাকাকে কতবার বলেছি, আমার চিকিৎসা করাও—আমি সেরে যাব, এ আমি আর সইতে পারছি না। কাকা বলেন, মারই হচ্ছে এ-রোগের ওষুধ। তোর বিয়ে দিতে পারব বলে আশা নেই, তবে কোনোদিন যদি দিতেই পারি, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বেশ করে ঠ্যাঙানি খেলেই রোগ পালাতে পথ পাবে না।

আচ্ছন্নভাবে বসে রইল সিতাংশু। বাইরে মাঠের ভিতর থেকে হাওয়ার গোঙানি ভেসে এল।

বাইশ বছর বয়স হল আমার, এ-যন্ত্রণা আমি আর বইতে পারব না। তাই ভেবেছি, কাল ভোরের ট্রেনে কলকাতায় চলে যাব। কাকা যেতে দেবেন না, টাকাও দেবেন না, পালিয়েই

যেতে হবে আমাকে। গিয়ে আমি ডাক্তার দেখাব, ভালো হতে, বাঁচতে চেষ্টা করব। শুধু যাওয়ার আগে আপনাকে বলতে এসেছি, অন্যায় আপনি করেননি, চোরকে তার পাওনা শাস্তিই দিয়েছিলেন।

পরক্ষণেই দরজার ফ্রেম থেকে মিলিয়ে গেল বুলু। একটা লঘু পায়ের শব্দ নেমে গেল অন্ধকারে।

স্বপ্ন—মায়া—মতিভ্রম? চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করল সিতাংশু—পারল না, কিছুতেই পারল না। কে যেন হিপনটাইজ করে তাকে নিশ্চল স্থবিরে পরিণত করে দিয়েছে।

একটা দমকা হাওয়ায় ইউক্যালিপটাসের কয়েকটা ঝরা পাতা এসে সিতাংশুর গায়ে মাথায় ছড়িয়ে পড়ল।

সিতাংশুর ঘোর ভাঙল পরদিন।

আজ আর উজ্জ্বলন্ত সকাল নয়। এতদিনের অগ্নিদহনের পর পৃথিবীর প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে—আকাশ মেঘে অন্ধকার—'বায়ু বহত পুরবৈঁয়া।' ঝিমঝিম বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। নামুক—আকাশ উজাড় করে নেমে আসুক। মরা মাটিতে নতুন অঙ্কুর মাথা তুলুক—শুকনো ইঁদারাগুলো জলে ভরে উঠুক, আর বুলু—

আর বুলু। স্বপ্ন—মায়া—মতিভ্রম। একটা অবিশ্বাস্য কাহিনী। বিচিত্র বিকৃতির নাগপাশে পাকে পাকে জড়ানো—তিলে তিলে মরে যাচ্ছে সে। আজ সকালের ট্রেনেই তার কলকাতা পালিয়ে যাওয়ার কথা। বাঁচুক—বেঁচে উঠুক বুলু। প্রার্থনার মতো উচ্চারণ করল সিতাংশু: এই বন্ধন থেকে সে মুক্তি পাক—এই অভিশাপের গণ্ডী পার হয়ে সূর্যস্নাত জীবনের মধ্যে তার উত্তরণ ঘটুক।

ভয় পাচ্ছেন? জানেন, এক্ষুনি আপনার টেবিল থেকে ঘড়ি, কলম—যা-হোক কিছু—

কথাটা কানের মধ্যে বেজে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের দিকে তাকাল সিতাংশু। ঘড়ি, কলম, চশমা, সব ঠিক আছে। কিন্তু ব্যাগ? মানিব্যাগটা?

কালকে পাওয়া মাইনের দু'শ পঁচিশ টাকা আছে ব্যাগে। পুরো দু'শ পঁচিশ টাকা। একটা পয়সাও খরচ হয় নি।

পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিল সিতাংশু। নেই। টেবিলের টানায়? সেখানেও নেই। না—বালিশের নিচেও না।

মুহূর্তে চোখে অন্ধকার। একটু আগেকার প্রার্থনা বীভৎস অভিসম্পাত হয়ে এগিয়ে এল গলায়। হিপনটিজ্ম্ই বটে। সেই জন্যে বুলু আলো জ্বালাতে বারণ করেছিল আর উত্তপ্ত বিচিত্র সন্ধ্যার বিহ্বলতার সুযোগে সিতাংশুর নির্বোধ আচ্ছন্নতাকে আরও ঘনীভূত করে দিয়ে ব্যাগটা তুলে নিয়ে সে সরে পড়েছে।

সিতাংশু ছুটল বিরাজবাবুর বাসায়।

শুধু আপনার ব্যাগ নিয়েছে? জান্তব চিৎকারে বিরাজবাবু ফেটে পড়লেন: আমার কী সর্বনাশ করেছে জানেন? গিন্নীর চার ভরির হার—ছ' গাছা চুড়ি—সব নিয়ে শেষ রাত্রে সরে পড়েছে।

সংশয়ের শেষটুকুও মুছে গেল।

কী করা যায় বিরাজবাবু?

থানায় চলুন—আর কী করবার আছে? বেঁটে ভারী চেহারার বিরাজবাবুকে নরখাদকের মতো দেখাতে লাগল: ক্রিমিন্যাল মশাই —বল্‌ন ক্রিমিন্যাল! ওই লজ্জাতেই দাদা অসময়ে মারা গেলেন। বিস্তর শাসন করেছি মশাই, চাবকে চামড়া তুলে দিয়েছি, দেওয়ালে ঠুকে ঠুকে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি, তবু স্বভাব ছাড়ানো গেল না। মেয়েছেলে, তায় আমাদের বংশের—কী করে যে এমন হল ভাবতেই পারা যায় না। চলুন থানায়, ও-মেয়ের জেলখাটাই দরকার।

ঘরের ভিতর বিরাজবাবুর স্ত্রীর ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না: দুধ দিয়ে আমি কাল সাপ পুষেছিলুম—আমার সর্বনাশ করে গেল—

বিরাজবাবু আরও খেপে গেলেন। হাত ধরে টানতে লাগলেন সিতাংশুর।

চলুন, চলুন, আর দেরি করবেন না। এখনও বোধহয় জসিডি পেরুতে পারে নি।

বুলু ফিরল সন্ধ্যের পর। পুলিস তাকে ফিরিয়ে এনেছে আসানসোল থেকে।

কিন্তু ততক্ষণে সিতাংশুর মনের আগুনটা নিবে গিয়েছে। সারা দিনের অশ্রান্ত বৃষ্টিতে পৃথিবীর মাটি স্নিগ্ধ হয়েছে, সুগন্ধ-শীতল ভিজে বাতাস শরীর জুড়িয়ে দিয়েছে। আর চুপচাপ বসে বসে সিতাংশু ভাবছিল, কী দরকার ছিল তু'শ পঁচিশ টাকার জন্যে অতখানি পাগলামি করবার? বাড়ি থেকে টাকা আনিয়ে যা-হোক করে এ-মাসটা তার চলে যেত, কিছু ধারও হয়ত হত, সেটা শোধ দেওয়া যেত আস্তে আস্তে। কেন সে করতে গেল এ-সব? হয়ত বুলু সত্যিই যাবে সাইকোলজিস্টের কাছে, এই টাকাটা দিয়ে নিজের চিকিৎসা করাবে, সুস্থ, স্বাভাবিক, সুন্দর হয়ে উঠবে। বুলুকে মেরে যে পাপ করেছিল—এই টাকায় তার প্রায়শ্চিত্ত হবে খানিকটা। কেন এতটা হীন হয়ে গেল সিতাংশু, কালকের সেই অভিশপ্ত বুলুকে সে ভুলে গেল কী করে?

এমন সময় প্রায় নাচতে নাচতে এলেন বিরাজবাবু।

চলুন, চলুন। শ্রীমতী পৌঁছেছেন।

ধড়ফড় করে উঠে বসল সিতাংশু, কোথায়?

হাজতে।

বুকের ভিতর হাতুড়ি পড়ল একটা। কালো হয়ে গেল মুখ।

মাপ করবেন, আমি প্যারব না।

পারবেন না কি? যেতেই হবে। খবর পাঠিয়েছে থানা থেকে।

আমার শরীর খারাপ।

নিষ্ঠুর হাসি হাসলেন বিরাজবাবু।

আপনি ইয়ং ম্যান, ওসব সেণ্টিমেণ্ট আমি বুঝি। কিন্তু আমার অনেক বয়েস হয়েছে মশাই। উঠুন—চলুন শিগগির—

একটা মৃতদেহের মতো সিতাংশুকে টেনে তুললেন রিকশায়। তার পর থানাতে।

থানাসুদ্ধ লোকের কৌতুক-ভরা চোখের সামনে একটা টুলে বসে আছে বুলু। রুক্ষ চুল, ভাষাহীন চোখ। সামনের দেওয়ালের দিকে স্থিরদৃষ্টি। আজ সারাদিন সে স্নান করে নি, খেতে পায় নি।

চোরের মতো একবার বুলুর দিকে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ পিছনে সরে গেল সিতাংশু, লুকিয়ে পড়তে চাইল। এইবার বুলুকে সে সম্পূর্ণ দেখছে—দেখছে কপালে এক ইঞ্চি লম্বা কাটা দাগটা এখনও শুকোয় নি। সিতাংশুর স্বাক্ষর।

কিন্তু সম্পূর্ণ কি দেখেছে সিতাংশু? না—দেখবার সাহস নেই। সাহস নেই, বুলুর আরক্ত ভাষাহীন চোখের দিকে সে তাকায়।

দারোগা বললেন, এই দেখুন গয়না। হার, চুড়ি—

বিরাজবাবু প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন সেগুলোর ওপর। বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ—এ সবই আমার স্ত্রীর—

বুলু কথা বললে এইবার। সেই শান্ত, সুরেলা গলা। যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

না, কাকীমার গয়না আমি নিই নি। ওসব আমার মায়ের জিনিস। কাকীমার কাছে ছিল।

মায়ের জিনিস! বীভৎসভাবে বিরাজবাবু ভেংচে উঠলেন: চোপরাও হারামজাদী! চোর!

বুলু আবার শান্ত গলায় বললে, আমি জানি—ও সবই আমার মায়ের। কাকীমার কোনও জিনিসই আমি ছুঁই নি।

বিরাজবাবু বুলুর উদ্দেশে প্রকাণ্ড একটা চড় তুলেছিলেন, দারোগা তাঁকে ধমক দিলেন, থামুন, আপনার স্ত্রী এসে গয়না সনাক্ত করবেন, আপনি গণ্ডগোল করবেন না। তার পর সিতাংশুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, শ'খানেক ক্যাশ টাকা পেয়েছি, কিন্তু আপনার ব্যাগ পাওয়া যায় নি।

বিরাজবাবু বললেন, ব্যাগটা রেখে দেবে—ওকি অমন কাঁচা চোর নাকি? আপনি ওকে চেনেন না সার—ও যে—

আঃ—দারোগা আবার ধমক দিলেন একটা।

বুলুর উদাস বিষণ্ণ স্বর শোনা গেল : আমি ওঁর ব্যাগ নিই নি। আমার নিজের চুড়ি বিক্রি করে—

বিরাজবাবু আবার ভেংচে উঠলেন, ওরে আমার সত্যবাদী যুধিষ্ঠির রে! নিজের চুড়ি বেচে উনি—

আর নয়। এর পরে আর কোনোমতেই দাঁড়ানো চলে না। চোরের মতো নিঃশব্দে পালিয়ে এল সিতাংশু। শুধু পথে আসতে আসতে বার বার মনে হল : আজ সারাদিন বুলুর খাওয়া হয় নি।

ব্যাগটা কিন্তু পাওয়া গেল। অফিসের ড্রয়ারেই রেখে এসেছিল।

এ-সন্দেহও সিতাংশুর মনে জাগতে পারত। কিন্তু সন্ধ্যায় এসে যদি এমনভাবে নিজের কথা না বলত বুলু, যদি বিরাজবাবুর বাড়ি থেকে গয়নাগুলো সে না নিত, যদি সত্যিই সে কলকাতায় পালাতে না চাইত, তা হলে—

ব্যাগটাকে তৎক্ষণাৎ পকেটে লুকিয়ে ফেলল সিতাংশু। এখন থানায় যাওয়া যায়? বলা যায়, বুলু তার টাকা নেয় নি? ভুল করে সে মিথ্যে এজাহার দিয়েছিল?

কিন্তু আর কি সম্ভব? তাতে নিজের উপরেই বিপদ টেনে আনা হবে। কেন তুমি এমন কাজ করলে? কেন একজন নির্দোষকে মিথ্যে নালিশ করে—

নাঃ, সে মনের জোর নেই সিতাংশুর। তাছাড়া এই হয়ত ভালো হল। জেলেই যাক বুলু। পাক দুঃখ, পাক লজ্জা। হয়ত এ থেকেই বুলু ভালো হয়ে উঠবে; যে সহজ স্বাভাবিক সুন্দর জীবনের মধ্যে সে যেতে চেয়েছিল, হয়ত তারই প্রস্তুতি হবে এখান থেকে।

বাইরে বৃষ্টি। দগ্ধ মাঠে নতুন অঙ্কুর। ইঁদারায় নতুন জল। বুলুর চোখেও কি বর্ষা নেমেছে এখন?

আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকাল। একটা রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্নের মতো। আর তখনই দেখতে পেল সিতাংশু। বুলুর জীবনের দিগ্-দিগন্ত জুড়ে অমনি একটা ক্ষতের স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছে সে।

যদিও সবটাই ম্যাজিক, তবু দৃশ্যটা সইতে পারে না অরুণা। উজ্জ্বল আলোর বৈদ্যুতিক করাতের সেই হিংস্র দাঁতগুলো যেন তারই বুকের ওপরে কেটে কেটে বসতে লাগল। এমন একটা বিশ্রী জিনিস না দেখালে কী ক্ষতি হয় ?

সোমেন অত্যন্ত খুশি হয়ে বললে, বাঃ-বাঃ !

অরুণা চোখ বুজে ফেলেছিল, সোমেনের গলার স্বরে চমকে ফিরে তাকাল তার মুখের দিকে। স্টেজের উজ্জ্বল আলোয় অন্ধকার অডিটোরিয়ামে একটা নীলাভ ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। সোমেনের ধারালো নাক-মুখ সেই ছায়ায় অদ্ভুত রকম তীক্ষ্ণ রেখাঙ্কিত হয়ে উঠেছে, আর ধকধক করে জ্বলছে তার চোখ। মুহূর্তে শিউরে উঠল অরুণা—স্টেজের বীভৎস দৃশ্যটার চাইতেও নিজের স্বামীকে তার আরও বীভৎস বলে মনে হল।

সভয়ে আবার চোখ বুজল অরুণা।

এর আগে চোখের সামনে যাত্রীসুদ্ধ মোটর গাড়ি অদৃশ্য হয়েছে—আরও অনেক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেছে। মুগ্ধ হয়ে দেখেছে অরুণা, উচ্ছ্বসিত হয়ে হাততালি দিয়েছে। কিন্তু বৈদ্যুতিক করাতের খেলাটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। হাঙরের দাঁতের মতো সারি সারি ইস্পাতের দাঁত যেন কেটে কেটে বসছে তার বুকের ওপর। আর—আর সোমেনের মুখ। অডিটোরিয়ামের নীলিম ছায়ায় সে মুখ যে এমন বীভৎস দেখাতে পারে অরুণা এর আগে তা কল্পনাও করতে পারে নি।

আবার চোখ বুজল সে। চোখের পাতা দুটোকে চেপে ধরতে চাইল প্রাণপণে।

উৎকট আনন্দে যেন দাঁতে দাঁত ঘষছে সোমেন। তার উত্তেজিত দ্রুত নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছে অরুণা। কেমন অবরুদ্ধ গলায় সোমেন বললে, ইউনিক।

অরুণার মাথার ভেতর সব কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া হয়ে আসতে চাইল। এয়ার-কণ্ডিশন্‌ড্‌ ঘরে একটা দম-আটকানো ভাব, এতগুলো মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কোথাও বুঝি একটুকুও অক্সিজেন আর অবশিষ্ট নেই। স্তব্ধ বাতাসটাকে আরও ভারাক্রান্ত করে তুলেছে প্রসাধনের গন্ধ, চুলের গন্ধ, বাক্স থেকে সদ্য-মুক্তি-পাওয়া শাড়ির ন্যাপথলিনের গন্ধ। অরুণার সমস্ত চেতনা কেমন যেন আবিষ্ট হয়ে এল।

শুধু সোমেনের মুখটা সে ভুলতে পারছে না। কয়েকটা অদ্ভুত কঠিন রেখার ওপর জ্বলন্ত চোখ। কপালে কয়েক বিন্দু ঘাম নিয়ে বসে অরুণা ভাবতে লাগল, ছেলেবেলায় দেওঘরের একটা অভিজ্ঞতার কথা। বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে পুরনো পোড়ো মতন একটা বাড়িতে কী যেন খেয়ালে ঢুকে পড়েছিল সে। গেটের পাশেই গ্যারাজের মতো একটা অন্ধকার ঘর। সেই ঘরে উঁকি দিয়ে অরুণা দেখেছিল, তার কোনায় সোমেনের মুখের মতোই কঠিন রেখা দিয়ে গড়া কী একটা চুপ করে বসে আছে, তার কালো শরীরের স্পষ্ট কোনো রূপ বোঝা যায় না, শুধু দুটো শীতল চোখ অরুণার দিকে এক ভাবে চেয়ে রয়েছে, স্থির হয়ে আছে দু' টুকরো আগুন, তাতে পলক পড়ছে না।

সেই বারো বছর বয়সেও অরুণা বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল, ওই চোখে এমন একটা নির্লজ্জ হিংস্রতা আছে, যা এর আগে কোথাও সে কোনোদিন দেখে নি। ও চোখ মানুষের নয়।

চিৎকার করে সে ছুটে পালিয়ে এসেছিল। লুকিয়ে পোড়ো বাড়িতে যাওয়ার কথা কাউকে সে বলতে পারে নি, ওই চোখ দুটোর কথাও না। হয়তো বিশেষ কিছুই নয়, হয়তো একটা কুকুর বসে ছিল, কিন্তু তার পর অনেক বার স্বপ্নের মধ্যে ওই হিংস্র অপলক দৃষ্টিটা অমানুষিক ভয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু সোমেনের চোখ দুটো অমন দেখাচ্ছে কেন? সোমেন তার স্বামী। কেন ভয় পাচ্ছে অরুণা?

প্রচণ্ড করতালির শব্দে ঘোর ভাঙল তার। জেগে উঠে দেখল, ম্যাজিক শেষ হয়ে গেছে, আলোয় ঝকমক করছে অডিটোরিয়াম আর উঠে দাঁড়িয়েছে সোমেন। তার স্বামী। সুদর্শন, শিক্ষিত, ভদ্রলোক। যে স্বামী তার আপন, তার আশ্রয়—যাকে তার ভয় করবার কোনো কারণই নেই।

সোমেন বললে, চল, যাওয়া যাক।

অরুণা বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। আঃ, বাইরের আকাশটা কত বড়!

রাস্তায় এসে ট্যাক্সি ডাকল সোমেন। গাড়িতে উঠে বললে, ময়দান চলিয়ে।

বাড়ি ফিরবে না?

অরুণা আশ্চর্য হল।

একটু মাঠে বেড়িয়ে যাই। মাথাটা ধরেছে। হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সোমেন বললে, রাত তো এখনও বেশি হয় নি।

অরুণা ভাবল, কথাটা তারই বলা উচিত ছিল। ওই দম-আটকানো ঘরের ভেতর, শাড়ি, প্রসাধন আর মানুষের গায়ের গন্ধে, স্টেজের ওপর ওই দানবিক প্রক্রিয়াটায় আর সোমেনের জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তারও মাথায় একটা চাপা যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে, এতক্ষণে সেটা যেন অনুভব করল সে। একটু বেড়ানো তারই দরকার।

গাড়ি চলল।

ছাড়া-ছাড়া আলো আর গাছের ছায়ায় অন্ধকার। কেমন অপরিচিত মনে হয় সব। বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল অরুণা। কী একটা বুঝতে চেষ্টা করছে, ঠিক বুঝতে পারছে না। রেসকোর্সের মাঠটাকে একটা বিশাল ভূতুড়ে স্টেজের মতো দেখাচ্ছে। আরও রাত হলে, আলোগুলোর রঙ আরও ঘন হয়ে উঠলে, মাঠের গাছপালায়, নিবিড় ঘাসের ওপর অন্ধকার একরাশ কালো আঠার মতো জড়িয়ে গেলে, এই রেসকোর্সের মাঠেও হয়তো এমনি একটা অলৌকিক ম্যাজিকের আসর বসবে। একটা বিরাট করাত দাঁতে

দাঁতে ঘষবার বিকট আওয়াজ তুলে কী যেন কেটে চলবে সমানে, আর নিউ রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ওপরের আলোটা ভয়ঙ্কর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তারই দিকে তাকিয়ে থাকবে সোমেনের মতো। অবশ্য সোমেনের যদি একটামাত্র চোখ থাকত।

অরুণার ভয় করতে লাগল। এই আলো, গাছের ছায়া, প্রায় অবাস্তব ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, প্রতীক্ষমান কালপুরুষের মতো কয়েকটা স্ট্যাচু, পাশে বসে-থাকা সোমেনের সিগারেটের আগুন— সব মিলিয়ে অরুণার অত্যন্ত খারাপ লাগতে লাগল।

হঠাৎ সোমেন কথা বললে: ওই গাছ তিনটে দেখতে পাচ্ছ? ওই যে একসঙ্গে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে?

দেখতে পেয়েছে বই কি অরুণা। খুব সম্ভব আমগাছ। বিচিত্র ভঙ্গিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে—যেন তিনটে ঝাঁকড়া মাথা চুপি চুপি কী একটা কুটিল পরামর্শ করে চলেছে। রাত্রে সব জিনিসের চেহারাই কী ভাবে যে বদলে যায়!

দিন পনরো আগে, ওখানে—। সোমেন সিগারেটে একটা টান দিলে, খানিক লালের আভা ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে: ওখানে খুন হয়ে গেছে। হরিব্‌ল্‌ ব্যাপার একটা।

অরুণা অস্ফুট শব্দ করল। নিঃশব্দ হাসি হেসে গাছ তিনটে যেন ছিটকে সরে গেল পেছনে।

সোমেন বললে, আমি ট্যাক্সি করে ভবানীপুর যাচ্ছিলুম, ওখানে একটা ছোট ভিড় দেখে নেমে পড়লুম একবার। কাছে গিয়ে দেখি, একজন পশ্চিমা মুসলমান। গলার অর্ধেকটা কাটা, চারপাশের মাটি রক্তে লাল, আঁষটে গন্ধ, মাছি উড়ছে।

অরুণা আর সহ্য করতে পারল না। প্রায় চিৎকার করে উঠল: আঃ—থামো! কী বকছ তুমি?

সোমেন অল্প একটু হাসল। সিগারেটটা ছুড়ে দিলে বাইরে। বললে, মেয়েরা ভারি সেন্টিমেন্টাল হয়। এতেই ভয় পেলে? তবু তো চোখে দেখ নি।

গাড়ি চলেছে। ছায়া আর আলো, ম্লান আলো আর অন্ধকার। গাড়ি পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়েছে। এক পাশে গাছের সারির ও-ধারে রাত্রির গঙ্গা। একটা জাহাজে অসংখ্য আলো, জেটিতে মানুষের ভিড়। কোনও একটা অনুষ্ঠান আছে ওখানে। ময়দানের বিভীষিকা পার হয়ে এতক্ষণে যেন একটা স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে পা দিয়েছে অরুণা। শুধু ভয় নয়, সেই সঙ্গে একরাশ তীব্র ঘৃণায় তার গা গুলিয়ে আসতে লাগল। গলার অর্ধেকটা কাটা রক্তে লাল, আঁষটে গন্ধ, মাছি উড়ছে—উঃ!

কী দরকার ছিল সোমেনের? কী দরকার ছিল জিনিসটা এমন বীভৎসভাবে তাকে শোনাবার?

বাড়ি চল, আমার শরীর খারাপ লাগছে।

সোমেন আবার সিগারেট ধরাল। চেন-স্মোকারের মতো ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছে আজ।

আবার ওই পথ দিয়েই ঘুরে যাব? জায়গাটা দেখবে ভালো করে? সত্যি, ওই রকম জায়গাতেই খুন করবার—

কী পাগলামি করছ তুমি!—ভয়ে বিস্ময়ে অরুণার হৃৎপিণ্ড থমকে যেতে চাইল: মানে কী এ-সবের?

বলেই সে সোমেনের দিকে তাকিয়ে দেখল। ঠিক যেন পুনরাবৃত্তি ঘটেছে একটা। সেই নীলাভ আলো, সেই প্রোফাইল—ধারালো মুখের রেখা, দুটো জ্বলন্ত চোখ, আর—আর সিগারেটের আগুনটা! একটা তৃতীয় নেত্রের মতো জ্বলছে যেন।

তৃতীয় নেত্রই বটে। অরুণা সন্ত্রস্ত আর্ত গলায় বললে, ফেলে দাও সিগারেটটা, ফেলে দাও এক্ষুনি!

কেন?

ফেলে দাও বলছি, শিগগির ফেলে দাও।

আশ্চর্য! মেয়েদের মনস্তত্ত্ব ভারি বিচিত্র!—সোমেন সিগারেটটা ফেলে দিলে না বটে, কিন্তু তখনই ট্যাক্সির অ্যাশ্‌ট্রেতে মুখ ঘষে নিবিয়ে ফেলল।

সীটের গায়ে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে অন্ধ চোখে আর বন্ধ গলায় অরুণা বললে, বাড়ি ফিরে চল। আমার একদম ভালো লাগছে না।

বেশ, চল তবে। সর্দারজী, কালীঘাট।

দোতলার বারান্দায় একটা ঈজি-চেয়ার টেনে চুপ করে শুয়ে ছিল সোমেন। রাত এগারোটার কাছাকাছি। অরুণা পাশে এসে দাঁড়ালো।

বসে আছ যে এখনও? খাবে না?

একটু পরে।—সোমেন চেয়ারের ওপর পিঠ সোজা করে উঠে বসল। হঠাৎ বেখাপ্পা প্রশ্ন করল একটা: অনুপম সেনের সঙ্গে তোমার দেখা হয় আজকাল?

চমকে উঠল অরুণা। মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল মুখ। বারান্দার এদিকের আলোটা নেবানো। অরুণাকে ভালো করে দেখতে পেল না সোমেন, কিন্তু তার মুখের রঙ বদলানো জানতে বাকি ছিল না তার। বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে অরুণা বুকের স্পন্দনটাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল। সোমেন কি কিছুতেই ভুলতে দেবে না?

আবার ও-কথা কেন তুলছ তুমি? সে তো আট বছর আগে-কার ব্যাপার।

এমনি। প্রায়ই মনে হয়।—সোমেন মৃদু হাসল: প্রথম প্রেম কিনা, তাই আট বছরেও বোধ হয় তাকে ভোলা যায় না।

ছিঃ ছিঃ, এসব তোমার মিথ্যে সন্দেহ। অনুপমদা আমাকে গান শেখাতেন। তার বেশি কিছুই নয়। কেন একটা বাজে কথা তুলে আমাকে কষ্ট দাও বার বার—নিজেও কষ্ট পাও?

বাজে কথা, না?—সোমেন আবার হাসল। কিন্তু হাসির শব্দটা এবারে দাঁতে দাঁতে ঘষা একটা বিশ্রী আওয়াজের মতো শোনালো।

বাজে কথা বই কি। অনুপমদা আমাকে গান শেখাতেন, স্নেহ করতেন।

স্নেহ করতেন নিশ্চয় !—সোমেন আস্তে আস্তে বললে, কালকেই তোমার পুরনো একটা গানের খাতা দেখছিলুম। তাতে এক জায়গায় অনুপম সেনের নাম লেখা আছে। তার ওপর তুমি লিখেছ : আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া—

অরুণা তীব্র গলায় বললে, কেন তুমি যখন-তখন আমার খাতা আর বইপত্র নাড়াচড়া করো, আর সব জিনিসের যা-তা মানে করে বাজে একটা কমপ্লেক্সে কষ্ট পাও ? আজ আট বছর ধরে—

সোমেন ক্রুর গলায় বললে, শুধু আট বছর কেন, আরও আটত্রিশ বছর হয়তো আমাকে বাঁচতে হবে। হয়তো আরও বেশি। আর সঙ্গে বেঁচে থাকবে অনুপম সেন। সেই ডায়ার্কির কথাটাই আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না। সেইটেই অসহ্য হয়ে উঠেছে অরুণা।

আজ তোমার কী হয়েছে ?—অরুণা প্রাণপণে নিজের মধ্যে খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করবার চেষ্টা করতে লাগল : যাকে মিথ্যে বলে জানো—

না, মিথ্যে বলে জানি না। তার চাইতেও বড় কথা, সত্য বলেও জানি না।—সোমেন তিক্ততম স্বরে বললে : তুমি আমাকে বুঝবে না অরুণা। আর না বোঝাই বোধ হয় ভালো।

হ্যাঁ, না বোঝাই ভালো।—অরুণা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিল সেখান থেকে। সোমেন তাকে পিছু ডাকল।

শোনো, ম্যাজিকটা কেমন দেখলে ?

আমার ভালো লাগে নি।

ভালো লাগে নি ? আশ্চর্য।—সোমেন কয়েক সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে অরুণার দিকে তাকিয়ে বললে : আমার তো দারুণ ভালো লাগল। আর বিশেষ করে লাস্ট আইটেমটা। সুপার্ব, থ্রীলিং। কাল যাবে আর একবার ?

শীতল কঠিন মুঠিতে কে তৎক্ষণাৎ অরুণার হৃৎপিণ্ড চেপে ধরল। বন্ধ হয়ে যেতে চাইল নিশ্বাস।

না না, আমি যেতে পারব না।—আর্তনাদ করে অরুণা বললে: আমি যাব না। ইচ্ছে হলে তুমি যাও।

পাগল! তা কি হয়?—শান্তভাবে সোমেন বললে: তুমি সঙ্গে না থাকলে দেখে সুখ হবে কেন?—একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললে, তার পর গড়ের মাঠে বেড়িয়ে—

এক মুহূর্তে সবগুলো জিনিস একটি অর্থ নিয়ে ধরা দিলে অরুণার কাছে। সেই করাত, সেই তিনটে গাছ, রক্তের গন্ধ, অনুপম সেন, কুটিল হিংসার অবচেতন চরিতার্থতা—

শুধু স্টেজে নয়, শুধু রেসকোর্সে নয়—এই ঘরে, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর যে করাতের তীক্ষ্ণধার দাঁতগুলো জীবনকে সমানে কেটে চলেছে, তার হাত থেকে মুক্তি কোথায় অরুণার? কোথায় পালাবে অরুণা?

সোমেনের সিগারেটের আগুন জ্বলতে লাগল, সেই তৃতীয় নেত্রের মতো।